মহিষাসুর
সৌম্যদীপ

মহিষাসুর

সৌম্যদীপ

হরপ্পা লিখন চিত্রণ অক্টোবর ২০১৯ সংখ্যায়
প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত
ই-বুক সংস্করণ

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে 'হরপ্পা'-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ১৮ আশ্বিন ১৪২৯ (ইং ৪ অক্টোবর ২০২২)
বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হল
'মহিষাসুর'

লিখন ও প্রচ্ছদ
সৌম্যদীপ

শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

অঙ্কন
পার্থ দাশগুপ্ত

সম্পাদনা
সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

ছোট্টবেলা থেকেই মহিষাসুরের উপর আমার খুব মায়া হত, মহালয়ার দিন রাত থাকতে রেডিয়ো চালিয়ে মা যখন ডেকে তুলত, বেজায় ঘুম-জড়ানো চোখে উৎসুক হয়ে উঠতাম, যদি অন্যরকম কিছু ঘটে—আমার ধারণা ছিল ওটা লিগ ফাইনালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা ভারত-পাকিস্তানের খেলার মতো, মহিষাসুর আর দেবী দুর্গার যুদ্ধের প্রাগৈতিহাসিক ধারাবিবরণী! প্রতিবার, "বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপাণি শংকর দিলেন শূল, যম দিলেন তাঁর দণ্ড, কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়্গ"...অমনি

মহিষাসুরের জন্য খুব খারাপ লাগত, আমাদের নতুন জামা-কাপড় হয়ে গেছে, বাটার জুতোও, ভোরবেলায় উঠোনে শিউলি আর... আমার চোখে ঘুম নেমে আসত। চটকা ভেঙে শুনতাম, "দেবী, কাত্যায়ন নন্দিনী কাত্যায়নী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে মহিষ মর্দন করেন। দ্বিতীয় ষোড়শভুজা ভদ্রকালীর হস্তে মর্দিত হয় মহিষ। আর তৃতীয়, এই বর্তমান কল্পে দশভুজা দুর্গা রূপে মহাদেবী সুসজ্জিতা মহিষমর্দিনী। অখিল মানবকণ্ঠে ধ্বনিত পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্র বন্দনা"—শিবের বউকে কেন যে এত বার নারায়ণী বলে কে জানে..."যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ"... জেগে উঠতাম 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি'—গানের সুরে, বাইরে তখন আলো ক্রমে আসিতেছে ...

ছোটো থেকে গোঁফ গজানো শুরু হওয়া পর্যন্ত ধারণাটা খুব একটা বদলায়নি যে ওটা কোনো প্রকৃত ঘটনার বিবরণ, তারপর গোদের উপর বিষফোঁড়া *কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো* পড়বার পরে পরেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, *লোকায়ত দর্শন* দিয়ে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন—বেদ-পুরাণ সবই শাসকশ্রেণির কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার প্রচেষ্টা, সমাজ বিকাশের পর্যায় (!) ঋগ্বেদ, নানা পুরাণ মায় গীতা আসুরি মতের নিন্দা করে, সেই আসুরি-মত লোকায়ত, যা তন্ত্র ও সাংখ্য-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঋকবেদে উল্লিখিত হরিয়ুপিয়া একটি অসুর-নগরী যা বাস্তবের হরপ্পা হতে পারে—গাদা-গাদা উদাহরণ আর পণ্ডিতদের মত প্রকাশক উদ্ধৃতি দিয়ে, কচি বয়সের উপপাদ্য আর জ্যামিতির এক্সট্রা করা মাথায় সবটুকু প্রত্যক্ষ

প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যেন! বইটা আমায় পড়তে দিয়েছিলেন দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, আমার মাস্টারমশাই, কৃষ্ণনগরের 'পাঠাগার মাস্টারমশাই', যিনি কখনো আমার বেড়েপাকা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি, লাইব্রেরি থেকে একটা বা দুটো বই তুলে বাড়ি ফেরার সময় হাতে ধরিয়ে দিতেন—এ কথাটা উল্লেখ করলাম কারণ আমার "দেববিরোধী" হয়ে ওঠার পেছনে 'দেব-দেবী'-দের অবদান বড়ো কম নয়। 'লিটল-গান্ধী' মাস্টারমশাইয়ের অসম্ভব পরিমিতিবোধের ছিটেফোঁটাও অনর্জিত রয়ে গেল—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই প্রচুর জ্ঞান দিই, খেতে দিলে গাদা গাদা খাই, লিখতে বললে পত্রিকার গুচ্ছের পাতা ধ্বংসাই, অল্পেতে বেজায় রেগে যাই অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে একটা আসুরিক ভাব স্বভাবজ বলা চলে—অতএব নান্যপন্থা!

আমাদের সময় পর্যন্ত মার্কস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু হতেই ফ্রয়েড নেড়েচেড়ে দেখাটা স্বাভাবিক পাঠক্রম ছিল, এমনকি দেবীপ্রসাদও একটা পাতলা বই লিখেছিলেন *ফ্রয়েড প্রসঙ্গে*, তা থেকেই হয়তো একটা ধারণা বাতাসে ভাসত—ফ্রয়েড আর মার্কসকে একটা সিন্থেসিসে আনতে পারলেই ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরির মতো, সব সমস্যার উত্তর পাওয়া যাবে! পড়াশোনা শুরুর মুখে এদিক-ওদিক শোনা, বিশ্বাস করা, কথাগুলো হয়তো পরবর্তীকালে সব পণ্ডিতের বেজায় বোকা-বোকা লাগে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন না আমার কিন্তু বিস্তর মজা লাগে, যাকে বলে 'হেব্বি আনন্দ হয়', কেন-না ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়! যাই হোক সেই ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে গিরীন্দ্রশেখর বসুর কথা জানা, তাঁর একটা বইয়ে 'এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ'-র মাঝে *শ্রীমদভাগবতগীতা* আর

পুরাণপ্রবেশ নাম দুটো দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, জোগাড় হয়েছিল অনেক পরে, বহুকষ্টে! এখন অবশ্য একটি অতি ভয়ানক প্রচ্ছদ ও প্রাককথনসহ *পুরাণপ্রবেশ* বাজারে পাওয়া যায়। *পুরাণপ্রবেশ* পাঠে বিষফোঁড়াটি ফাটে এবং পুরাণকে হিস্ট্রি বা ইতবৃত্ত হিসাবে পাঠের একটি প্রবেশদ্বার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসহ আমার সামনে খুলে যায়, যা দেবীপ্রসাদ হতে অন্যতর—মাঝে সময় কেটেছে চোদ্দোটি বছর।

প্রবন্ধ লিখতে বসেও এত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ তথা মন্তব্য এসে যায় যে সেটা মাঝে মাঝে নিজের কাছেও অস্বস্তিকর ঠেকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো হালকা বিষয়ও এটা নয়, অথচ অন্য কোনো বিশেষ পথও খুঁজে পাইনি। তবে *ওরিয়েন্টালিজম*-এর ভূমিকায় এডওয়ার্ড সঈদ এই personal dimension বিষয়ে গ্রামশির *প্রিজন নোটবুক* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পদ্ধতিগতভাবে এটাকেই সমর্থন বা আত্মপক্ষ সমর্থনে দাঁড় করিয়েছিলেন: "*প্রিজন নোটবুক*-এ গ্রামশি বলেছিলেন: 'The starting-point of critical elaboration is the consciousness of what one really is, and is 'knowing thyself' as a product of the historical process to date, which has deposited in you an infinity of traces, without leaving an inventory.'।" একমাত্র লভ্য ইংরেজি অনুবাদটিতে গ্রামশির ঠিক পরের মন্তব্যটি বাদ পড়ে গেছে, গ্রামশির ইটালিয়ান লেখায় বক্তব্যটি শেষ হয়েছে এই বাক্যটি সংযুক্ত করে, 'therefore it is imperative at the outset to compile such an inventory.' 1979, *Orientalism*, Edward Said, Vintage, p 25. উপরন্তু 'Knowing thyself'—

ভারতীয় হওয়ার কারণে আমার কাছে 'আত্মানং বিদ্ধি' তারপরেও এই লেখায় ব্যক্তিগত দেব-বিরোধিতার প্রভাব কমানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অগ্রজ ভাবুক ও গ্রন্থকারদের বক্তব্য তথা উদ্ধৃতি ব্যবহার করেই আমার বক্তব্যের গন্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছি, যদিও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার চূড়ান্ত মতদ্বৈধ রয়েছে।

পুরাণপ্রবেশ লেখক গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, পুরাণ মিথোলজি নয়, ভারতীয়দের History-রক্ষণ পদ্ধতি, 'হিস্টরি' অর্থ ইতিহাস নয়, ইতিহাস হল Tradition, ঐতিহ্য বা পুরাবৃত্ত (historical stories handed down by tradition) ইতিহাসের অন্তর্গত। History-র প্রতিশব্দ তিনি তৈরি করেন '**ইতবৃত্ত**'। তাঁর দেওয়া কিছু ধারণা, যেমন **দিবিকরণ** অর্থাৎ উত্তম মনুষ্যের প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতায় পরিণত হওয়া। যেমন **বিভিন্ন জাতি** অর্থাৎ মনু বংশীয়রা মনুষ্য এবং দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প, নাগ, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ ইত্যাদি হল অন্যান্য জাতিমাত্র। এছাড়া তাঁর **ইতবৃত্তীয় কালনির্নয়, পর্যায়কাল গণনা** এবং **পৌরাণিক অত্যুক্তিবিচার** পদ্ধতি আমার পুরাণ নিয়ে আগ্রহের জন্ম দেয় এবং ঘাঁটাঘাঁটি শুরু হয়। তার আগে পর্যন্ত উপনিষদ ছাড়া আর কিছুই পড়ার প্রয়োজন আছে বলে বুঝতে পারিনি। বাবার আলমারিতে এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বইপত্র থাকায় প্রাথমিক পাঠ এর জন্য বিশেষ ঝামেলা পোহাতে হয়নি। আর আছেন সুবর্ণরেখা ইন্দ্রনাথবাবুর 'কবিরাজ' সোদপুরের কল্যাণদা, কলেজ স্ট্রিটের লাইন ঢুঁড়ে গত পনেরো বছরে এই সংক্রান্ত কত বই যে এনে দিয়েছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

মহিষাসুরকে নিয়ে লিখতে বসে প্রথম মাথায় আসছে গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বানানোর কাহিনিটি, সেখানে অসুরদের কথা আছে।

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যৈর্দেবাঃ পরাজিতাঃ।।
রক্ষ রক্ষেতি বদন্তো জগ্মুরীশ্বরম্।
মায়ামোহস্বরূপোহসৌ শুদ্ধোদনসুতোহভবৎ।
মোহয়ামাস দৈত্যাংস্তাংস্ত্যজিতা বেদধর্মকম্।।
তে চ বৌদ্ধাঃ বভুবুর্হি তেভ্যোহন্যে বেদবর্জিতাঃ।
আর্হতঃ সোহভবৎ পশ্চাদর্হতান করোৎ পরান্
এবং পাষণ্ডিনো জাতা বেদধর্মবিবর্জিতাঃ।।

—*অগ্নিপুরাণ* ১৬।১-৪

পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে দৈত্যগণের দ্বারা দেবগণ পরাজিত হলেন। তাঁরা বিষ্ণুর কাছে 'রক্ষা করো রক্ষা করো' বলে স্মরণ নিলেন। বিষ্ণু শুদ্ধোদনের পুত্র হলেন। তিনি দৈত্যদের মোহিত করলেন। তারা বেদ ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ হল। তাদের মধ্যে অন্যরাও বেদ বর্জিত হল। তিনি আর্হত হলেন এবং পরে সকলকে আর্হিত করলেন। এইরূপে পাষণ্ডগণ বেদধর্মবর্জিত হয়েছিল।

হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় পর্বের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লিখছেন—

"এই বুদ্ধদেব দানবদের বেদধর্মবিবর্জিত করায় দেবগণের অসুরবিজয় সহজসাধ্য হয়েছিল। সারদাতিলক তন্ত্রে দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধবন্দনায় বলা হয়েছে—

পুরা সুরানামসুরানবিজেতু সম্ভবয়নচীবরচিহ্নবেশম্।
চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘকল্পং তং মূলভূতং প্রণহতোস্মি বুদ্ধম্।।

পুরাকালে দেবতাদের অসুরবিজয় সম্ভব করতে যিনি চীবর পরিধান করেছিলেন সেই মূল কারণ বুদ্ধকে প্রণাম করি।"

এই উদাহরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে আমাদের পুরাণ বা ইতিহাস লেখার পদ্ধতি। বুদ্ধকে অন্তত আমরা পাথুরে প্রমাণে মোটামুটিভাবে সময় নির্দেশ করে হিস্ট্রি অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি। এই পুরাণকাহিনির সঙ্গে ইতবৃত্ত বা হিস্ট্রির তুলনা করলেই বোঝা যাবে যাবতীয় পক্ষাবলম্বন তত্ত্ব। গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছিলেন, "নব্য ইতবৃত্তকারগণ অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ বুদ্ধি ও কল্পনা আশ্রয় করিয়া ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করেন। তাতে ইতবৃত্ত পক্ষপাতদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা, মূল বিবরণও সাধারণের অনধিগম্য থাকিয়া যায়। অপরপক্ষে হিন্দু পৌরাণিক সূক্তোক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন মাত্র, তিনি তা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন না। অনেক সময় একই ঘটনার পরস্পর বিরোধী বিবরণ পুরাণকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু নিজ বুদ্ধি ও কল্পনা সাহায্যে সত্যোদ্ধারের কোনও চেষ্টা করেন নাই। এসকল ক্ষেত্রে পুরাণব্যাখ্যাকার সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন। পুরাণকার ও পুরাণব্যাখ্যাকার এর অধিকার ভিন্ন হওয়ায় ইতবৃত্তীয় উপাত্ত বা (History) সকল সময়েই জনসাধারনের অধিগম্য। এ বিষয়ে পৌরাণিক পদ্ধতি আধুনিক ইতিবৃত্তকারের পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

অতএব জনসাধারণের অংশ হিসেবে তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পুরাণ ব্যাখ্যা করবার অধিকার আমার রয়েছে। অগ্নিপুরাণ থেকে সাধারণ বাঙালির অন্তত এটুকু বোঝা উচিত যে সে বেদধর্মবর্জিত অসুর পর্যায়ভুক্ত এবং বুদ্ধ অহিংসার বাণী প্রচার করে তাদের অহিংসাব্রতী করেন এবং দেবগণ মওকা বুঝে

তাদের নেতৃবৃন্দকে বিনাশ করেন। ভবিষ্যপুরাণে যিশু, মহম্মদ, রানি এলিজাবেথ সবার কথাই আছে শুনেছি, থাকাই স্বাভাবিক কারণ ভারতীয় ইতিহাস (History) লিখন বা বর্ণন পদ্ধতির নামই পুরাণ, যা গিরীন্দ্রশেখর বসু অব্যর্থভাবে ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধ অবতার-এর পুরাণকাহিনি ও প্রামাণ্য ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস লেখার পদ্ধতিটিকে বুঝে নিয়ে যদি তার আগের পুরাণকাহিনিগুলিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে প্রকৃত ইতবৃত্ত বা হিস্টরিক্যাল ঘটনাগুলির গতিপ্রকৃতি বেশ কিছুটা বুঝতে পারা যায়। আর এই পদ্ধতিতে ধর্মীয়, বৈদিক বা দৈবিক খোলস ছাড়ালে দেব ও অসুর জাতির দ্বন্দ্বের কারণ পরিষ্কার বোঝা যাবে।

পুরাণ কাহিনিতে মহিষাসুর

মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর ৮২ তম অংশের শুরুতে বলা হয়েছে দেবতা ও অসুরের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলেছিল অসুরপতি মহিষাসুরের নেতৃত্বে।

দেবাসুরমভুদযুদ্ধং পূর্ণমব্দশতমপুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে।।
তত্রাসুরৈর্মহাবীর্য্যৈ পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলানদেবানিদ্রোহভ্।।

চণ্ডীতে দেবীর উদর তৈরি হচ্ছে ইন্দ্রের শক্তিতে, সুরাপ্রেমী ইন্দ্র, আসবাসক্তি যাঁর সর্বজনবিদিত, ফলত দেবী মদিরা পান করেন যুদ্ধের আগে দেবীর ঠোঁট দিয়ে ছিলেন শিবঠাকুর, দেবী সেই ঠোঁটে প্রকাণ্ড রব তুলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অসুর উপজাতির

লোকেরা নাকি মহিষাসুরকে বলে **হুদুড় দুর্গা** বা বজ্রের মতো আওয়াজকারী, এই আওয়াজ উলুধ্বনিও হতে পারে অথবা 'হর-হর', যা হুদুড় শব্দে বোঝাবার চেষ্টা হতে পারে। শব্দ নিয়ে আলোচনা করতেই হবে কারণ যে-কোনো ভাষ্য উৎপাদিত হয় ভাষার মাঝে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের ফলে। যেমন মহিষাসুরের জন্ম কাহিনি—মহিষাসুরের পিতা রম্ভ নামে এক অসুর, মাতা 'এক মহিষী', মহিষী অর্থাৎ ভৈসা (!!) বা মোষ আর তাই মহিষাসুরের অর্ধেক শরীর মোষের আর অর্ধেক অসুরের! খাসা যুক্তি কিন্তু ইন্দ্রের মহিষী শচী বা দশরথের তিন মহিষীর গর্ভের চার সন্তান সকলেরই অর্ধেক শরীর মোষের হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে মহা ঈশ পত্নী মহিষী, 'রাজপত্নী' অর্থে দিব্য চলবে, অথচ মহিষাসুরের বেলায় হয়ে যাবে স্রেফ ভৈসা বা মোষ! দন্ত্য-স তালব্য-শ মূর্ধণ্য-ষ নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু ভাট-ভাষ্য আছে যা আমি জানি না, তবে জানি সেগুলো এই একই অবস্থান থেকে তৈরি। ভারতীয় পুরাণের বিশেষত্ব এই যে সবসময় আগেরও আগে আছে, ব্রহ্মার বছর থেকে কল্প পার হয়ে সবকিছু সেই বিগ ব্যাং এর সময় নিয়ে যাওয়া হবে, তারও আগে জানতে চাইলে মডার্ন ফিজিক্স-এর মতোই মহাকালে চলে যাবে, সময় সৃষ্টির আগে এবং ব্রাহ্মদিন ব্রাহ্মরাত্রি পেরিয়ে (এক ব্রাহ্ম অহোরাত্রি = ২×১০০০ চতুর্যুগ = ৮৬৪০০০০০০০ মানব্বর্ষ, দ্র *পুরাণপ্রবেশ*, পৌরাণিক কালগণনা, পৃ ২২) সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের গোল-গল্পে চলে যাবে, যেখানে আবার বিগ ব্যাং-এর পরে বিগ ক্রাঞ্চ এবং পুনরায় বিগ ব্যাং হয়! কারো বাবার ক্ষমতা নেই এই যুক্তিকে অংক কষে খণ্ডায়! আর এই বৃত্তকল্পই

ভারতীয় 'দর্শন-বিজ্ঞান'-এর সর্বোচ্চ আবিষ্কার যেখানে বাকি পৃথিবী অনেক পেছনে, সে 'শূন্য' ধারণা হোক কিংবা 'পুনর্জন্ম', এই আবিষ্কার লা-জবাব। মহাকাশ বিজ্ঞান হোক, প্রত্নতত্ত্ব হোক অথবা ইতিহাস, মূলত কিছু গল্পকথা যা অতি সংক্ষিপ্ত ধারণা আকারে মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয়। সব উত্তর মিলিয়ে দেওয়া একান্ত ভারতীয় এই **বৃত্তকল্প গোলগল্প** পৃথিবীতে আর কেউ কখনও বানাতে পারেনি।

তো সেই আগেরও আগের গল্প হল মহিষাসুরের বাবা রম্ভের এক ভাই ছিল সে হল করম্ভ (জানি না কোথায় আছে, কিন্তু অবশ্যই রম্ভ ও করম্ভের বাবার নাম আরম্ভ হবে) দুজনে মিলে কঠোর তপস্যায় বসেছিলেন তাঁরা। একটুও নড়াচড়া না-করে সাধনা করবেন **রম্ভ** এই সংকল্প করেছিলেন। **করম্ভ** সাধনা করছিলেন জলের মাঝে বসে। দুই ভাই তপস্যার সিদ্ধিলাভ করলে তাঁর আসন টলে যাবে দেখে **ইন্দ্র** কুম্ভীররূপে নিরস্ত্র করম্ভকে হত্যা করেন। রম্ভ টের পেলেও তপস্যাভঙ্গ করেননি, তপস্যা শেষে রম্ভ শোকে আত্মহত্যা করতে গেলে **অগ্নিদেব** তাঁকে বর দেন তাঁর পুত্র ইন্দ্রকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে।

ওই আগেরও আগের গল্প রম্ভ-করম্ভ শব্দের মাঝেই আছে, রম্ভ শব্দের অর্থ 'শব্দ', 'বেণু', 'বানর বিশেষ' করম্ভ শব্দের অর্থ 'দধি জল' বা 'দধি জলের সহিত যা শব্দ করে', 'উদমন্থ', 'কর্দম' (মেধাতিথি) তপ্ত (কুল্লুক) "করম্ভবালুকা তাপান" মনু ১২.৭৬। করম্ভক আবার বিবিধ ভাষায় গদ্য পদ্যময় কাব্য! কী জ্বালা!

রম্ভ-করম্ভ উভয়েই তপস্যা করছিল কারণ তাদের অতুলৈশ্বর্য সত্ত্বেও কোনো সন্তান ছিল না। তাঁরা সন্তানার্থে তপস্যা

করছিলেন, চোখের পলক না-ফেলে, নড়াচড়া না-করে, কিছু না-খেয়ে, হাজার বর্ষ ধরে! (কে জানে কোন বর্ষ! দেব্বর্ষ তো বটেই দেবতার একদিন মানে মানুষের একবছর) উপরন্তু করম্ভ তপস্যা করছিলেন জলের তলায় বসে তাঁকে ইন্দ্র হত্যা করেন। (এইসব মহাগল্প যদি বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের মহাগল্পের সঙ্গে গুলিয়ে যায় তা-তে কাউকে দোষ দেওয়ার নেই। একমাত্র মহাগাম্বাট নাহলে ঘেঁটে যাওয়াই স্বাভাবিক।) সেই মহালয়ার শুরুতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যেমন বলে ওঠেন: **নারায়ণ** তখন যোগনিদ্রায়, তাঁর কর্ণমল থেকে উদ্ভূত হল **মধু** ও **কৈটভ**। তাঁরা নাভিপদ্মাসীন ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, তাঁর কাতর আহ্বানে **মহামায়া যোগনিদ্রা** দেবী নারায়ণের শরীর হতে বহির্গত হলেন, **বিষ্ণু** জাগ্রত হয়ে সুদর্শন চক্র দ্বারা মধুকৈটভের মস্তক ছেদন করলেন, তাঁদের মেদ দ্বারা মেদিনী তৈরি। অতীব মজা এইখানে, কৈটভের স্ত্রী লিঙ্গান্তরে কৈটভী অর্থ দুর্গা, মধুবংশীয়রা হলেন মাধব যা কৃষ্ণের অপর নাম! মজা পেয়ে একটাই অক্ষর থাকবে 'ঘ', অবশ্যই ঘেঁটে গিয়ে। দেবী অপর এক রূপে হত্যা করেন দুই সহোদর দৈত্য **শুম্ভ** এবং **নিশুম্ভ**কে। √**শুম্ভ্** অর্থাৎ হিংসা। ধরে নেয়া যাক সেটা শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ। মহিষাসুরের ক্ষেত্রে ঘটনাটা হল, মহিষাসুর স্বর্গ থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করলে ইন্দ্র অন্য দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁদের তেজ একত্রিত হয়ে **চণ্ডী** আবির্ভূতা হলেন। **মহিষাসুর** নাকি তার আগে অমরত্বের প্রার্থনা করে **ব্রহ্মা**র কাছে সুকঠোর তপস্যা করেন, ব্রহ্মা বলেন অমরত্ব তো দেওয়া যাবে না, মৃত্যুর উপর শর্ত আরোপ করতে পারো। তখন নাকি মহিষাসুর

কোনো পুরুষ তাঁকে হত্যা করতে পারবে না, এই বর প্রাপ্ত হন। যাবতীয় কাহিনিতে অসুরদের 'স্ট্রিক্ট মরালিটি' দেখা যায়, যেখানে বল ছাড়া ছল বা কৌশলের স্থান নেই। ছল ও কৌশল 'স্পেসিফিক্যালি' দেবতাদের অস্ত্র। বিষ্ণুর প্রায় সব অবতার কাহিনি বিভিন্ন ছলনার গল্প। সেগুলি ছাড়াও সমুদ্রমন্থনের পর মেয়ে সেজে 'সিডিউস' করে অসুরদের বঞ্চিত করে অমৃত হরণের কাহিনি সর্বজনবিদিত। এমনকি ওই মধুকৈটভের গল্পটা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ যেমন উচ্চারণ করেন পুরাণে আদৌ সেরকম নয় বহুদিন যুদ্ধ চলার পরেও বিষ্ণু তাঁদের কিছুই করতে পারেননি। বহুবর্ষ যুদ্ধের পর মধু-কৈটভ সমর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বিষ্ণুর সঙ্গে লড়াই করে খুশি হয়েছেন বলে তাঁকে বর দিতে চান। বিষ্ণু তখন বর চান যেন ওঁরা তাঁর হস্তেই মৃত্যুবরণ করেন, এবং সেই বর পাওয়া মাত্র বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা মধুকৈটভের মস্তক ছেদন করেন! এটা অসুরদের বোকামির গল্প নাকি সত্যনিষ্ঠার মহানতার গল্প, সেকথা পাঠক তাঁর ব্যক্তি-মানসিকতার গঠন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করবেন। রাক্ষসদের আসুরী মায়ার কথা শোনা যায়, যার বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় সেটা ছলনা নয় স্রেফ 'টেকনোলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট'। অসুর নৈতিকতায় কোনো স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলার প্রশ্নই ওঠে না। যেমনটা অনেক পরে মহাভারত-এ দেখি অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রাখলে ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেন। দেবী দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কখনো অষ্টভুজা চতুর্ভুজা ষড়ভুজা কোথাও বা অষ্টাদশভুজা, এই সমস্তকে মেলানোর জন্য একটা গল্প ভাবাই যায়—দুর্গার স্বাভাবিক মহিলাদের মতোই দুটি হাত, তা নিরস্ত্র অর্থাৎ বরাভয় ও কমণ্ডলুধারী। পেছনে দেবতারা

তাঁদের অস্ত্রগুলি নিয়ে—বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, বরুণের তিরধনুক, ইন্দ্রের বজ্র ইত্যাদি। খুব স্বাভাবিকভাবেই ত্রিভুবন অধীশ্বর মহিষাসুর কোনো নিরস্ত্র মহিলার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করেননি। কোনো-কোনো পুরাণে আছে রূপে মুগ্ধ হয়ে মহিষাসুর দেবীকে বিবাহপ্রস্তাব করেছিলেন, দেবী বলেন যে-পুরুষ তাঁকে যুদ্ধে হারাতে পারবেন তাঁকেই বরমাল্য পরাবেন। নানারূপে যুদ্ধ করে শেষে মহিষরূপে যুদ্ধ করছিলেন মহিষাসুর, দেবীর সব অস্ত্র বিফল হলে তিনি মহিষাসুরের কাঁধে পা তুলে দেন। কণ্ঠে পরমাসুন্দরী দেবীর সুকোমল পদস্পর্শে মহিষাসুর বিবশ হয়ে গেছিলেন! তখন দেবী বর্শা দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করেন! আজব যুদ্ধ বর্ণনা! অসুর উপজাতির হুদুড় দুর্গার মৃত্যু বিবরণের সঙ্গে কোথাও একটা মিলে যায় যেন! চণ্ডী বর্ণিত যুদ্ধ বিবরণে যাওয়ার আগে উল্লেখ্য বাঙালি দুর্গার হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু কিন্তু সেই শৈবাস্ত্র ত্রিশূলে। বিষ্ণুপন্থীদের শিবের অস্ত্র ত্রিশূল ব্যবহারের পলিটিক্স এখনো দেখা যায়, নইলে রামমন্দির নির্মাণের ধুয়ো তুলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিশূল বিলি করবে কেন! তিরধনুক দিতে পারত। 'জয় শ্রীরাম'-এর সঙ্গে 'হর হর মহাদেব' স্লোগান উঠবে কেন শৈব ব্রাহ্মণ রাবণকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যাকারী রামের মন্দির বানাবার প্রজেক্টে! (রাবণের মৃত্যুবাণ চুরি করা হয়েছিল মন্দোদরীকে ঠকিয়ে—কৃত্তিবাস)। যাইহোক ইন্দ্রদেবকে পরাজিত করতে পারবে এমন পুত্রের বর প্রদান করার পর অগ্নিদেব রম্ভের চারিধারে এক অগ্নিবলয় রচনা করেন, যে স্ত্রী এই অগ্নিবলয়ে প্রবেশ করবে সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হবে এবং রম্ভের অভীপ্সা পূর্ণ হবে। রম্ভের হুঙ্কারে আশেপাশের সব প্রাণী

ভয় পেয়ে পালাতে থাকে কিন্তু এক **মহিষী** সেই অগ্নিবলয়ে প্রবিষ্ট হয় এবং গর্ভবতী হয়। তখন এক **মহিষ** এসে সেই মহিষীকে আক্রমণ করে, **রম্ভ** সেই আক্রমণ সহ্য করতে না-পেরে নিহত হন, সেই মহিষীও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন সেই মহিষীর পেট ফেঁড়ে এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, যার অর্ধ শরীর মহিষের। গল্পের শেষাংশ থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব, ওই মহিষী রম্ভের মহিষী ছিলেন না ছিলেন ওই আক্রমণকারী মহিষের মহিষী এবং তিনি কাণ্ড দেখে পুরোপুরি মানুষিক আচরণ করেন একজন সাধারণ পুরুষ মানুষের মতো। **মহিষ** ও **মহিষী**-র শব্দ ব্যাখ্যা পরে জানতে চেষ্টা করব, আপাতত মহিষাসুরের অর্ধেক মহিষ হওয়ার গল্পটার সিধে ব্যাখ্যা এরকম দেওয়া যায়—একটি জঙ্গল-সম্পৃক্ত জনজাতি যারা মহিষের পিঠে চেপে ঘোরাঘুরি, এমনকি যুদ্ধও করত, (আমি ধরে নিচ্ছি কিন্নরদের অর্ধেক শরীর ঘোড়ার মতো, এটার অর্থ তারা প্রায় সর্বক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে থাকত) এবং পরবর্তীকালে হয়তো এরাই তথাকথিত '**রাক্ষস**' হয়ে উঠছিল কারণ মহিষ নামক প্রাণীটির ওপর নির্ভরশীলতা থাকলে প্রচুর জলাভূমির প্রয়োজন হয়, সেজন্য তারা জল বা অসু রক্ষা করতে চেয়েছিল, তাই তাদের নাম হলো রাক্ষস। এই 'রক্ষা করিব' থেকে রাক্ষস হয়ে ওঠার গল্পের আরেকটা ভারর্সন আছে—সৃষ্টি কালে ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় যেসব সৃষ্টি করেন, তারা অন্ধকারে বিকৃত ক্ষুধার্ত রূপেই সৃষ্ট হয়। তারা ক্ষুধার্ত হয়ে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। একদল তাঁকে রক্ষা করতে চায়, যারা ভক্ষণ করতে চেয়েছিল তারা হল **যক্ষ** আর যারা রক্ষা করতে চেয়েছিল তারা হল **রাক্ষস**। যক্ষরা ছিল কুবেরের অনুচর। সে অর্থে যাঁরা

এখন জল-জঙ্গল-জলাভূমি রক্ষার বা সংরক্ষণের কথা বলেন, আজকের পৃথিবীর কুবেরের অনুচরদের কাছে (মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেটস) তাঁরা সবাই রাক্ষস। যেমন মনিরত্নমের ছবিতে রাবণ অভিষেক বচ্চন ছিলেন মাওবাদী রাক্ষস। প্রায় ওই একই কারণে রাবণও রাক্ষস, তিনি তাঁর দাদা কুবেরকে তার সকল অনুচর সমেত লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করেন এবং প্রসিদ্ধ পুষ্পক রথটি কেড়ে নেন। **কুবের** তখন তাঁর ধনরত্ন নিয়ে দেবতাদের আশ্রয়ে গিয়ে তাদের খাজাঞ্চি হন এবং দেবতা স্তরে উন্নীত হন। ঠিক আমাদের কলকাতায় ইংরেজ রাজত্বের দেওয়ান ও দালালদের রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে হেব্বি বনেদি রাজবাড়ি হাঁকাবার মতো। যাইহোক বিভিন্ন পুরাণে পূর্বে স্বকৃত নজরটানে হাবুডুবু খেয়ে অবশেষে অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পৌরাণিকী* অভিধানের সহায়তায় মহিষাসুরের গল্পটাকে মিলিয়ে মিশিয়ে বললে মোটামুটি যা দাঁড়ায়, সেটা এইরকম—**দনু**র ছেলে, **রম্ভ** ও **করম্ভ**। অপুত্রক দুই ভাই। সন্তান কামনায় রম্ভ পঞ্চাগ্নি জ্বেলে এবং করম্ভ জলে নেমে কঠোর তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র ভয়ে কুমির হয়ে এসে করম্ভকে খেয়ে ফেলেন। তপস্যায় কোনো ফল হচ্ছে না দেখে রম্ভ শেষ পর্যন্ত আগুনে নিজের মাথা কেটে আত্মাহুতি দিতে যান। অপর মতে ভাইয়ের শোকে প্রাণ বিসর্জন দিতে যান। অগ্নি/মহাদেব রম্ভকে বারণ করেন রম্ভ ত্রৈলোক্য বিজয়ী এবং অগ্নির চেয়ে ভাস্বর একটি ছেলে চান এবং অগ্নি বর দেন। রম্ভ বর পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে অন্য মতে যক্ষদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যক্ষদের দেশে অল্প বয়সি/ তিন বছর বয়সি একটি ঋতুমতী মহিষ দেখতে পান ও ভোগ করেন। অন্য

মতে বিয়ে করেন। গর্ভবতী হলে স্ত্রীকে নিয়ে রম্ভ **পাতালে** চলে যান যাতে অন্য মহিষ আক্রমণ করতে না-পারে। কিন্তু পাতালে অন্যান্য **দানব**রা মহিষীর সঙ্গে বাস করতে দেখে রম্ভকে তাড়িয়ে দেন। রম্ভ তখন আবার যক্ষমণ্ডলে ফিরে আসেন। যথা সময়ে একটি ছেলে হয় এই ছেলে বিখ্যাত **মহিষাসুর**। ইতিমধ্যে একটি মহিষ এই মহিষীটির প্রণয়াসক্ত হয়ে রম্ভকে একদিন আক্রমণ করে হত্যা করে। রম্ভের স্ত্রী তখন যক্ষদের আশ্রয় নেন। মহিষটি হতাশ হয়ে জলে প্রাণ বিসর্জন করে বিখ্যাত **নমর** হয়ে জন্মান। রম্ভের দেহ সৎকার করা হয় এবং রম্ভের স্ত্রী সহমৃতা হন এবং রম্ভর জ্বলন্ত চিতা থেকে মহিষাসুর বার হয়ে আসেন। রম্ভও তখন পুত্রস্নেহে রূপান্তরিত হয়ে উঠে আসেন এবং নাম হয় **রক্তবীজ**। তিনি শিবের কাছে বর পান যুদ্ধে তাঁর প্রতিটি ভূপতিত রক্তবিন্দু থেকে সমান শক্তিশালী আর একটি রক্তবীজ জন্মে যুদ্ধ করবে। রক্তবীজ সমস্ত যক্ষদের তাড়িয়ে দেন এবং সমস্ত মহিষদের হত্যা করেন। রম্ভের ছেলে মহিষাসুর রাজা হন। রক্তবীজ পরে **শুম্ভ** নিশুম্ভের সেনাপতি হয়েছিলেন।

মহিষাসুর নিজের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে স্বর্গ জয় করার জন্য দূত পাঠিয়ে ইন্দ্রকে পরাজয় স্বীকার করতে বলেন। ইন্দ্র অবজ্ঞায় দূতকে ফিরিয়ে দিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন জনের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তীব্র যুদ্ধ হয়। বিষ্ণু ও মহাদেবও যুদ্ধ করেন। তবু দেবতারা হেরে যান। মহিষাসুর তখন কয়েক শতাব্দী ধরে স্বর্গে রাজত্ব করতে থাকেন। রক্তবীজ, **চণ্ডমুণ্ড** ইত্যাদি এসে মিলিত হন। মহিষাসুরের প্রধানমন্ত্রী হন **অসিলোমা**, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী **চিক্ষুর**, বিদেশ মন্ত্রী **বিড়াল**, অর্থমন্ত্রী

তাম্র, সেনাপতি **উদর্ক**, শিক্ষামন্ত্রী **শুক্রাচার্য**। দুর্দান্ত মহিষাসুরকে বামুনরাও যজ্ঞভাগ দিতে থাকেন। দেবতাদের ক্রমান্বয়ে নিপীড়ন করতে থাকলে দেবতারা আবার ব্রহ্মা ও শিবকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন। বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মারই বরে এই অসুর অবধ্য।

মহিষমর্দিনী তখন বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থান করছিলেন। মহিষাসুর এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করার জন্য **দুন্দুভি**কে দূত পাঠান। দূত দেবীর কাছে তিরস্কৃত হয়ে ফিরে এসে জানায় দেবী বীর্যশুল্কা। মহিষাসুর তখন সসৈন্যে এগিয়ে আসেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর সবশেষে মহিষাসুর সরাসরি যুদ্ধে আসেন। মহিষাসুর নানা মূর্তি ধরে দেবীকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন এবং শেষকালে মহিষরূপ ধরে আক্রমণ করলে দুর্গা তাঁর সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেও কিছু করতে পারেন না। দুর্গা তখন মহিষাসুরের কাঁধে এক পা দিয়ে চেপে ধরেন। পদস্পর্শে অসুর মুক্তির স্বাদ পেয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েন দুর্গা এই সময় বর্শা বিদ্ধ করে এঁকে নিহত করেন। চিক্ষুর, অসিলোমা, তাম্র, দুর্মুখ, বাষ্কল, বিড়াল ইত্যাদিও নিহত হন। **মহিষাসুর** তিনবার জন্মেছিলেন। প্রথমবার **উগ্রচণ্ডা**, দ্বিতীয়বারে **ভদ্রকালী** ও তৃতীয়বারে **দুর্গা** তাঁকে নিহত করেন।

অপরমতে বিপন্ন দেবতারা বিষ্ণুর শরণ নিলে বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য। দেবতাদের তেজ মিলিত হয়ে যে দেবীকে সৃষ্টি করবে তিনিই এই অসুরকে মারতে পারবেন। অসুরদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ দেবতাদের মুখ থেকে তখন একটি করে জ্যোতি বার হতে থাকে এই সব জ্যোতি মিলিত হয়ে মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে আসে, মহর্ষির তেজও মিলিত হয়। এই মিলিত তেজ কালীর পরিত্যক্ত চর্মের খোলসের মধ্যে প্রবেশ

করে দেবী **কাত্যায়নী** রূপে প্রকাশিত হন। ইনি অষ্টাদশভুজা। বিভিন্ন দেবতার তেজে এঁর বিভিন্ন অঙ্গ গঠন। মহাদেব এঁকে ত্রিশূল, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শতঘ্নী, পবন তূণ ও ধনু, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডলু ও অন্য দেবতারা নানা অস্ত্র ও আভরণ দেন। এই ভাবে সজ্জিত দেবী হুঙ্কার দিয়ে উঠলে অগস্ত্য এঁর নাম দেন **দুর্গা**। দুর্গা তখন সিংহের পিঠে চড়ে বিন্ধ্যপর্বতে চলে যান।

এই দেবী মহিষাসুরকে তিনবার বধ করে ছিলেন প্রথমবার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে দ্বিতীয়বার ষোড়শভুজা ভদ্রকালী ও তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গা রূপে। স্বপ্নে **ভদ্রকালী**র মূর্তি দেখে মহিষাসুর এই মূর্তির আরাধনা করেছিলেন। দেবী দেখা দিলে মহিষাসুর জানান মৃত্যুতে তিনি ভীত নন, তিনি চান দেবীর সঙ্গে তিনিও যেন পূজিত হন। **দেবী বর দিয়েছিলেন উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী বা দুর্গা, তিন মূর্তিতেই অসুর তাঁর পদলগ্ন থাকবেন এবং দেবতা, রাক্ষস ও মানুষের পূজ্য হবেন।**

স্কন্দপুরাণে **দুর্গ দৈত্য**কে নিহত করে দেবী দুর্গা নামে খ্যাত হন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলেছেন দুর্গ অসুরকে বধ করে তিনি দুর্গা নামে পরিচিত হবেন। দেবী ভাগবতে হিরণ্যাক্ষ বংশে জন্ম **দুর্গাসুর** বধ কাহিনি বিস্তারিতভাবে আছে। স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে **রুরু** দৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরের কাহিনি রয়েছে।

স্কন্দপুরাণে ইনি দেবী **বৈষ্ণবী**। পৌরাণিক বহু কাহিনিতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সঙ্গেও দুর্গা যুক্ত রয়েছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী=চণ্ডী=অম্বিকা, দুর্গা ইত্যাদি নাম আছে। কিন্তু তিনি পর্বতবাসিনী, পর্বতকন্যা নন। হরিবংশে অনিরুদ্ধ বন্দি হলে দুর্গা শব্দ (২১২০।৩৫) ব্যবহৃত হয়েছে। হরিবংশে আর্যা স্তোত্রেও

বলা হয়েছে 'যশোদাগর্ভসম্ভূতাম্ নন্দগোপকুলে জাত'। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইনি বৈষ্ণবী শক্তি। বৃহৎসংহিতাতে ইনি **একানংশা** কৃষ্ণ বলরামের মাঝখানে অবস্থিত। দেবীপুরাণ-এ মত্তদিগ্গজের পিঠে বসে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। দেবীপুরাণ-এ দুর্গে বিরাজমানা এবং দেবী ভাগবতে **নগরপালিকা** বলা হয়েছে। স্কন্দপুরাণে কাশী রক্ষার নিমিত্ত মহাদেব নন্দীকে প্রতি দুর্গে দুর্গাপ্রতিমা স্থাপন করতে বলেন। চাণক্য বলেছেন প্রতি দুর্গে দেবতাদের সঙ্গে অপরাজিতাকেও স্থাপন করতে হবে এবং এই **অপরাজিতা** পণ্ডিতদের মতে দেবী দুর্গা।

দুর্গাপূজা স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে (কালিকা ৬০।৩৯) রাতেই ব্রহ্মণা বোধিতা দেবী, দেবতারা তারপর পূজা করেন। আশ্বিনে শুক্লা অষ্টমী দুর্গা অষ্টমী নবমীতে রাবণ নিহত (৬০।৩০)। দেবী অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মূর্তি গড়ে তিনবছর দেবীর পূজা করেছিলেন। ত্রেতা যুগে **রাবণ** চৈত্রমাসে এঁর পূজা (বাসন্তী পূজা) করতেন। রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র অকালে এঁর শারদীয়া পূজা করেন বাল্মীকি রামায়ণ-এ কিন্তু এ ঘটনাটি নেই। অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার সময় মনে হয় বাসন্তীপূজা অধিক প্রচলিত ছিল। শারদীয়া পূজা তখনও চালু হয়নি। বাল্মীকি রামায়ণ-এ রাবণবধ ঠিক শরৎকালে হয়নি। দেবীভাগবতে ও বৃহদ্ধর্মপুরাণে রাম শরৎকালে পূজা করে রাবণবধ করেন। ফলে কৃত্তিবাসও শরৎকালে রামকে দিয়ে পূজা করান। বিষ্ণুযামলে আছে শরতে ঘরে ঘরে দুর্গাপূজা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৯২।১১) দেবী বলেছেন শরৎকালে পূজা করতে হবে।

দুর্গা বা চণ্ডীকে বহু স্থানে **গোধাসনা** দেখা যায়। গোধিকা বা গোধা মানে গোসাপ। প্রাচীন বিদিশার অদূরে উদয়গিরি গুহাতে আঠেরো হাত দুর্গার মূর্তি আছে এটি খ্রিস্টীয় ৫-শতকে খোদিত দেবী ওপরের দু-হাত দিয়ে একটি গোধা ধারণ করে আছেন। দুর্গার এটি প্রাচীনতম মূর্তি। কলিকাতা জাদুঘরে খ্রিস্টীয় ১২ শতকে নির্মিত গোধাসনা **চণ্ডী**মূর্তি আছে। গোধাবাহনা চণ্ডীর বহুমূর্তি পাওয়া গেছে। জৈন মূর্তি শিল্পে গোধাবাহন **গৌরী**র উল্লেখ আছে। কালিকাপুরাণে চণ্ডিকার কাছে গোধিকা বলি দেওয়া হবে বলা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মহাবস্তুতে গোধাজাতক রয়েছে। তন্ত্রসার-এ বর্ণিত দুর্গা ও **মহিষমর্দিনী** আধুনিক দুর্গা প্রতিমা থেকে আলাদা। মহিষমর্দিনী প্রতিমা তামিলনাড়ুতে বর্তমানে প্রচলিত। বঙ্গদেশে বর্তমানে পূজিত প্রতিমা কাত্যায়নী মূর্তি।

ব্রহ্মযামলে আছে 'কালিকা বঙ্গদেশে চ'। খ্রিস্টীয় ১৪ শতক থেকে দুর্গাপূজার বিধান বাংলাতে কিছু-কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায় তবে মনে করা হয় খ্রিস্টীয় ১২-১৩ শতক থেকে বাংলাতে পূজা চালু হয়েছিল। বিহারের কিছু কিছু অংশে এবং বাংলা ও অসমে দুর্গাপূজা হয়। ভারতে অন্যত্র নবরাত্রি ইত্যাদি ব্রত। এই পূজা মূলত উৎসব ভিত্তিক। রাজারা ও জমিদাররা নিজেদের আভিজাত্যের ও ঐশ্বর্যের প্রমাণ হিসাবে দুর্গাপূজা করতেন। এটি শক্তি পূজা। তবে বামাচারী পূজা নয়। কিন্তু তবু তন্ত্রের ছাপ বহুস্থানে রয়ে গেছে। যেমন প্রতিমা বিসর্জনের সময় বলা হয়েছে, 'ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়য়েয়ুঃ অলং জনাঃ' (*কালিকা* ৬১।২১)। বৈদিক সাহিত্যে দুর্গার উল্লেখ আছে। তন্ত্র ও পুরাণে বিশেষ আলোচনা ও পূজাবিধি রয়েছে। **দুর্গা,**

মহিষমর্দিনী, শূলিনী, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা ইত্যাদি বহু নামে এঁর পূজা হয়। তন্ত্রে ইনি চতুর্ভুজা, সিংহস্থা, মরকতবর্ণা। পুরাণ অনুসারে বাংলায় অতসী পুষ্প বর্ণা ইত্যাদি। আশ্বিনে শুক্লপক্ষে শারদীয়া এবং চৈত্রে শুক্লপক্ষে বাসন্তী পূজা এই দুর্গার পূজা।

ভদ্রকালী ভগবতীর একটি রূপ। মহিষাসুর একবার স্বপ্ন দেখেন দেবী তাঁর মাথা কেটে রক্ত পান করছেন। ফলে দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য দেবীর পূজা করেন এবং দেবী সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলে মহিষাসুর জানান **ক্যাতায়ন** মুনির শিষ্য **রৌদ্রাশ্ব** যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন সেই সময় মহিষাসুর মেয়ের রূপ ধরে তাঁর তপস্যাভঙ্গ করেছিলেন। কাত্যায়ন ফলে রেগে যান এবং শাপ দেন মেয়েমানুষের হাতেই মহিষাসুর মারা যাবেন। মহিষাসুর আরও বলেন, তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর সময় হয়ে এসেছে। তাই যজ্ঞভাগের অধিকারী হওয়ার জন্য এবং দেবীর পদসেবক হয়ে থাকতে পারার বর চান। ভদ্রকালী বোঝান যজ্ঞভাগ দেবতারা ভাগ করে নিয়েছেন। তবে মহিষাসুর মারা গেলেও দুর্গা, উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালীর পায়ে সে বিলগ্ন থাকবে এবং দেবীদের সঙ্গে সে-ও পূজা পাবে।

কাত্যায়নী ভগবতী মূর্তি। কাত্যায়নের শাপের কারণে ব্রহ্মাদি দেবতাদের নিজ-নিজ দেহ থেকে তেজ বার হয়ে এই তেজ মিলিত হয়ে এই দেবীর সৃষ্টি হয়। কাত্যায়ন এঁর প্রথম পূজা করেন বলে নাম **কাত্যায়নী**। **দশভুজা সিংহবাহিনী**। আশ্বিনে কৃষ্ণা চতুর্দশীতে বোধিত হন সপ্তমীতে দেবতেজে আকার গ্রহণ অষ্টমীতে অলংকৃত, নবমীতে মহিষাসুরকে বধ। বৃহদ্ধর্মপুরাণে

ব্রহ্মা আশ্বিনে কৃষ্ণা নবমীতে বোধন করে ছিলেন। দেবীর বরে কৃষ্ণা নবমীতে কুম্ভকর্ণ, এয়োদশীতে লক্ষ্মণের হাতে অতিকায়, অমাবস্যা রাত্রিতে মেঘনাদ, প্রতিপদে যমরাক্ষ, দ্বিতীয়াতে দেবান্তক নিহত হন। সপ্তমীতে দেবী রামের অস্ত্রে প্রবেশ করেন, অষ্টমীতে রামরাবণের যুদ্ধ। অষ্টমী নবমী সন্ধিতে রাবণের মাথা সাময়িকভাবে ছিন্ন হয়, নবমীতে নিহত হয়। কাত্যায়নী দশভুজা হরিবংশে অষ্টাদশভুজা। কাদম্বরী ও ভাগবত ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে। একটি মতে কাত্যায়নের শাপের কারণে দেবীর উদ্ভব দেবতাদের মিলিত তেজমূর্তি! কাত্যায়ন প্রথম পূজা করেছিলেন বলে নাম হয় কাত্যায়নী। হরিবংশে দেবীকে **কিরাতী চীনবসনা চৌরসেনানমস্কৃতাম্** বলা হয়েছে **বনে ও উপবনে থাকেন শবরপুলিন্দবর্বরৈ অভিপূজিতা**। সারদা তিলকে **পুলিন্দ কন্যা**। নারদ পঞ্চরাত্রে কিরাতিনী বেশ। *কথাসরিৎসাগর*-এর গল্পে এর নমুনা পাওয়া যায়।

কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের মুদ্রায় **ঈশ** ও **ননা** মূর্তি রয়েছে। গুপ্তযুগে (খ্রিস্টীয় ৪-৫ শতকে) মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি প্রচলিত হয়েছিল। ভিলসার নিকট উদয়গিরিতে বরাহ-গুহাতে খ্রিস্টীয় ৫-শতকে নির্মিত দ্বাদশভুজা মূর্তি রয়েছে দেবী শূলের দ্বারা মহিষাকৃতি একটি অসুরকে বধ করছেন। দেবীর দু-হাতে গোধা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ খ্রিস্টীয় ৫-শতকে রচিত। খ্রিস্টীয় ১১-শতকে ভবদেব ভট্ট দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচনা করেছিলেন। **দুর্গাপূজাটি কাত্যায়নী পূজা**।

উগ্রচণ্ডা আশ্বিন মাসে কৃষ্ণা নবমীতে কোটি যোগিনীর সঙ্গে প্রথমে আবির্ভূত হয়ে **অষ্টাদশভুজা** দেবী মহিষাসুরের

প্রথম মূর্তি বিনাশ করেন। দক্ষ যজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করে উগ্রচণ্ডা রূপ নিয়ে কোটি যোগিনীসহ শিবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করেন। কালিকাপুরাণে কাত্যায়নীই উগ্রচণ্ডার রূপ ধারণ করেন। আবার দুর্গার অষ্টনায়িকার মধ্যেও একজন। কালিকাপুরাণে প্রথম সৃষ্টিতে উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ভদ্রকালী এবং তৃতীয় সৃষ্টিতে দুর্গারূপে মহিষাসুরকে বধ করেন। ভিন্নাঞ্জন সদৃশা, সিংহবাহিনী (কালিকা ৬০।১২৪)। এঁর অষ্টযোগিনী— **কৌশিকী**, **শিবদূতী**, **উমা**, **হৈমবতী**, **ঈশ্বরী**, **শাকম্ভরী**, **দুর্গা** ও **মহোদরী** (কালিকা ৬১।৪১)।

চণ্ডী শিবের শক্তি। অন্য নাম চণ্ডিকা অর্থাৎ **প্রচণ্ডা**। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবতারা ক্রুদ্ধ হলে এদের মুখ থেকে তেজ বার হতে থাকে এবং এই সব তেজ মিলিত হয়ে শিবের তেজে মুখ, বিষ্ণুর তেজে বাহু, ব্রহ্মার তেজে পায়ের পাতা, চন্দ্রর তেজে স্তন ইত্যাদি পূর্ণাবয়ব মূর্তি দেখা দেয়। দেবতারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র থেকে অস্ত্র এবং হিমালয় সিংহ দেন। শুম্ভ, নিশুম্ভ বধের পূর্বে দেবতাদের স্তবে প্রীত হলে দেবীর দেহ থেকে যিনি বার হয়ে আসেন তিনি কৌশিকী এবং অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে রইল তিনি **কালিকা**, হিমালয়ে আশ্রয় নেন। চণ্ডিকা পার্বতীর উগ্রমূর্তি। অনেক সময় ২০, ১০ বা ১২টি হাতও দেখা যায়।

দেবী ভাগবতে মহিষাসুর বধের জন্য ব্রহ্মা এসেছিলেন মহাদেবের কাছে। ব্রহ্মার বর ছিল নারীর হাতে মৃত্যু। শিব চিন্তায় পড়েন। বিষ্ণু প্রস্তাব দেন সকলের তেজ থেকে এক জন দেবী তৈরি হোক। দেবী ভাগবতে এই আবির্ভূতা দেবীর নাম **মহালক্ষ্মী**

বামন পুরাণে ইনি কাত্যায়নী। দেবতাদের তেজ কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে এসে রূপ নিয়েছিল বলে এই নাম। এই **কাত্যায়নী শিবের কেউ নন**। তবে মহিষাসুর বধের পর দেবতারা ও সিদ্ধরা স্তব করেন এবং দেবী তখন হরপাদমূলে প্রবেশ করেন। বামন পুরাণেও কাত্যায়নী এই ভাবে রূপ পান। কালিকাপুরাণে এই কাহিনি একটু বদলায় দেবতাদের তেজে ধৃত বপুঃ এবং কাত্যায়নেন সন্ধুক্ষিতা (কালি ৬০।৭৭)। অর্থাৎ কাত্যায়ন যেন তিলোত্তমার মতো কাউকে সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ চণ্ডী কাত্যায়নী।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডীর দেহ থেকে **ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী** ইত্যাদি শক্তি বার হয়ে **শুম্ভ-দৈত্য** বধে সাহায্য করেন। এই সব দেবীর সাহায্য নেওয়ার জন্য শুম্ভ বিদ্রূপ করলে দেবীরা সকলে আবার চণ্ডীর স্তনে লীন হয়ে যান। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও বামনপুরাণে রক্তবীজ বধের সময় দেবীর মুখ থেকে ব্রহ্মাণী, **কৌমারী** ইত্যাদি দেখা দেন। দেবীর বর্ণনায় চার হাত, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, রত্নকলস, ও পুস্তক হাতে মূর্তিও দেখা যায়। মহিষাসুর বধের সময় চণ্ডী পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব।

শুম্ভ নিশুম্ভকে যিনি বধ করেন তাঁকে কেবল হিমালয়বাসিনী বলা হয়েছে। **তিন জনেরই শিবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই**। প্রথম দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা, মহামায়া দ্বিতীয় দেবী দেবগণের তথা শিবের তেজ থেকে উৎপন্ন। তৃতীয় দেবীর সম্বন্ধে বলা আছে দেবতারা হিমালয়ে এসে 'বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টবুঃ'। সকলেই এঁরা শিবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এ ছাড়াও আছে শিব এই দেবীর দূত হয়ে শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে গিয়েছিলেন ফলে দেবীর নাম শিবদূতী (*চণ্ডী* ৮।২৭)। *চণ্ডী*-তে দেবী স্বতন্ত্রা-মূলদেবী তবে

কিছুটা বিষ্ণু আশ্রিতা। দেবীভাগবতে ইনি **পরমেশ্বরী**, জননী সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তথেশ্বরী ১।১৫।৩৪)। *চণ্ডী*-তে ইনি কোথাও শিবমায়া বা শিবশক্তি নন। সবসময় সিংহবাহিনী, আট বা দশভুজা।

শিখগুরু গোবিন্দ সিং-এর চণ্ডীগীতি বলে একটি রচনা আছে। ইনি উজ্জয়িনীর রাজকন্যা। পরে সেই রাজ্যের শাসক। ইন্দ্র এসে এঁর কাছে সাহায্য চান। ইনি বাঘের পিঠে চড়ে অসুর বিনাশ করেছিলেন।

চামুণ্ডা মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডমুণ্ডকে নিহত করে এদের মুণ্ড নিয়ে কালী অট্টহাস করলে চণ্ডী কালীকে এই নাম দিয়েছিলেন। চণ্ডমুণ্ড তাদের সৈন্যদল নিয়ে দেবীকে আক্রমণ করলে দেবী বার হয়ে আসেন দুর্গার কপাল থেকে। রক্তবীজ অসুরের প্রতি রক্ত বিন্দু মাটিতে পড়লে সেই বিন্দু সমান শক্তিমান আর একটি অসুরে পরিণত হত। যুদ্ধে আহত রক্তবীজের রক্ত যাতে মাটিতে পড়তে না-পারে সেই জন্য এই দেবী রক্তবীজের দেহ নির্গত রক্ত পান করতে থাকেন। রক্তবীজ এইভাবে অন্য অসুরের জন্ম দিতে না-পেরে মারা যান।

চামুণ্ডা কালো, করালবদনা, গায়ের চামড়া দড়িপাকান, ভীষণ দেখতে বিরাট মুখ, লকলকে জিব, এবং লাল, কোটরাগত চোখ, পরণে বাঘছাল, গলায় মুণ্ডমালা। অস্ত্র হচ্ছে অসি, পাশ ও খটাঙ্গ। তন্ত্রসারে বাঁ-হাতে পাশ ও নরমুণ্ড, ডানহাতে বজ্র ও খট্টাঙ্গ। মুখমণ্ডল সুন্দর ও কোটি দাঁত। মাথায় চুল পিঙ্গল, বাহন শব। শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা বা নির্মাংসা এবং দ্বীপিচর্মধরা। **কালী** কিন্তু সাধারণ সুস্থ চেহারা। চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি **রুদ্রচর্চিকা**,

রুদ্রচামুণ্ডা, **সিদ্ধচামুণ্ডা**, **সিদ্ধ যোগেশ্বরী**, **রূপবিদ্যা-ভৈরবী**, **ক্ষমা** ইত্যাদি। বামন পুরাণে **রুরু** দানবের চর্ম (বর্ম) ও মুণ্ড কালী ছেদন করে চামুণ্ডা নাম পান। বিভিন্ন পুরাণ মতে মাতৃকারা সাত, আট বা নয়। **মাতৃকাদের নাম ব্রহ্মাণী**, **মাহেশ্বরী**, **কৌমারী**, **বৈষ্ণবী**, **বারাহী**, **ইন্দ্রাণী**, **চামুণ্ডা**, **শিবদূতী ও নারসিংহী**। অর্থাৎ চামুণ্ডা একজন মাতৃকা। অগ্নিপুরাণে মাতৃকাদের নাম চামুণ্ডা ব্রহ্মাণী, চামুণ্ডা মাহেশ্বরী ইত্যাদি, এখানে চামুণ্ডা একক নাম নেই। চামুণ্ডাকে অনেক জায়গায় যমের শক্তি **যামী** বলা হয়। আবার শিবের ঘোর রূপ ভৈরবের শক্তিকেও চামুণ্ডা বলা হয়। ব্রহ্মাণী ইত্যাদি যেমন ব্রহ্মা ইত্যাদির শক্তি। বাজসনেয়সংহিতায় **মনোজবা** মনে হয় মুণ্ডকোপনিষদের যমের পত্নী যামী এবং ইনিই চামুণ্ডা। মনোজবাকে চামুণ্ডা ধরলে খ্রিস্টপূর্ব সময়ের দেবী। মনে হয় চামুণ্ডা ও দেবীর বিভিন্ন রূপের অনেকগুলি রূপ প্রাগ-আর্যদের কাছ থেকে এসে তথাকথিত আর্য ধর্মের সঙ্গে মিশেছে। চামুণ্ডা, ব্রহ্মাণী, কালিকা ইত্যাদি দেবীকে ফল শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও মনে করা হয় এবং **চামুণ্ডা মানকচুর দেবী**। এই দৃষ্টিভঙ্গিও প্রাক্-আর্য জাতির কাছ থেকে পাওয়া। চামুণ্ডার পূজা একদিন সারা ভারতে ছড়িয়েছিল। ওড়িশার যাজপুরে প্রাচীন বিরজা ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত মূর্তি ও ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলে চামুণ্ডার ভয়ংকর মূর্তিটির চার হাত, অস্থিসার, মুণ্ডমালা, শবাসন। শবের হাত অঞ্জলিবদ্ধ। বড়ো বড়ো দাঁত। গভীর কোটর থেকে চোখ ঠেলে বার হয়ে আসছে। টাক মাথা থেকে অগ্নিশিখা বার হচ্ছে। হাতে কত্রি, শূল, কপাল ও নরমুণ্ড। যাজপুরে পাওয়া মূর্তিটি দ্বিভুজা, কঙ্কালসার, বসে আছেন, লম্বকর্ণ, সরু, গলিত

স্তন। মুখে একটি ভয়াল ভাব। বৌদ্ধ নিষ্পন্নযোগাবলিতে চামুণ্ডার উল্লেখ আছে বজ্রযানীদের **চর্চিকা**-চামুণ্ডা রূপী চামুণ্ডাকে স্পষ্ট চেনা যায়। পিকিঙেও একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তি সম্ভবত তান্ত্রিক-সাধকদের মধ্যেই অধিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বশীকরণ ইত্যাদি আভিচারিক কাজেও চামুণ্ডার পূজা হয়।

স্কন্দপুরাণে দেবী **বিন্ধ্যবাসিনী**, রুরু দৈত্যের পুত্র **দুর্গ** বা **দুর্গম অসুর**কে বধ করেছিলেন। তিনি হিরণ্যাক্ষ বংশজাত রুরু-র পুত্র। জন্ম থেকেই দেবতাদের শত্রু! ভেবে ঠিক করেন বেদ নষ্ট করতে পারলে কোনো যজ্ঞ হবে না দেবতারা তখন দুর্বল হয়ে পড়বেন। দুর্গম তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর চান এবং বেদ হস্তগত করেন। ফলে বামুনরা মন্ত্র ভুলে যান, যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়, দেবতারা শীর্ণকায় হয়ে পর্বত গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অসুর অমরাবতী অধিকার করেন। যজ্ঞের অভাবে অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী ধ্বংস হতে যায়। দেবতাদের স্তুতিতে তখন দেবীর শত নয়নে অশ্রুপাত হতে থাকে (*দে-ভাগ* ৭।২৮।৩৮) নবরাত্র-ব্যাপী একটানা বৃষ্টিতে পৃথিবী জলপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেবতারা তখন দেবীকে **শতাক্ষী** নাম (*দে-ভাগ* ৭।২৮) দেন। অন্য মতে বামুনরা তখন হিমালয়ে গিয়ে দুর্গার শরণ নেন। এদের দুঃখের কথা শুনে দুর্গার চোখে জল আসে ফলে পৃথিবী আবার সজল হয়ে ওঠে। দুর্গা তখন ক্ষুধার্ত দেবতাদের সকলকে শাক ভোজন করতে দিয়ে রক্ষা করেন ফলে দুর্গা **শাকম্ভরী** নামে পরিচিত হন। দুর্গম এদিকে খবর পেয়ে এসে আক্রমণ করেন দেবী প্রথমে **কালরাত্রি**কে দূত হিসাবে পাঠান, তারপর দুর্গার দেহ থেকে **বগলা**, **মাতঙ্গী**, **গুহ্যকালী** ইত্যাদি অসংখ্য দেবী বার

হন। দুর্গাসুর প্রথমে হাতি তারপর মহিষ হয়ে যুদ্ধ করতে থাকে এবং ১১ দিনের যুদ্ধের পর বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর হাতে নিহত হয়। দুর্গমের তেজ দেবীর দেহে মিলিয়ে যায়। দেবী বেদ ফিরিয়ে দেন। নাম হয় দুর্গা। মনে রাখতে হবে রাবণ কর্তৃক বেদবতীর সম্মান হরণ যিনি পরজন্মে সীতা।

কালিকাপুরাণ অনুসারে দীর্ঘকাল রম্ভ মহাদেবের সাধনা করেছিল, সন্তুষ্ট হয়ে **মহাদেব বর দিতে চাইলে রম্ভ তাঁকে তিন জন্ম পুত্ররূপে পেতে চেয়ে বলেন, আপনি চিরায়ু সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়ে আমার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করুন। মহাদেব বলেন তথাস্তু ফেরার সময় এক তরুণী কন্যার সঙ্গে মিলনের ফলে মহিষাসুরের জন্ম হয়।**

দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী নামক বইতে সুধীরকুমার মিত্র বলেছেন, "স্বয়ং দেবী দুর্গা হইয়া মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন, কারণ শিব জম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুর রূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অসুর দেহ ঘুচানো অবতারের কার্য নহে বলিয়া দেবী স্বয়ং উহা করিয়াছিলেন"। (পৃ ১৬১)

বরাহপুরাণ মতে দৈত্য **বিপ্রচিত্তি**-র **মাহিষ্মতী** নাম্নী কন্যা **সিন্ধুদ্বীপ** নামক তপস্যারত ঋষিকে মহিষ বেশে ভয় দেখিয়েছিল, তখন ঋষি তাকে "মহিষ-ই হও" এই অভিশাপ প্রদান করেন। সেই **মাহিষ্মতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম** হয়। (*চণ্ডী* ১১।। ৪৩-৪৪ মন্বন্তরের বিপ্রচিত্তি-র উল্লেখ আছে।— উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *শ্রীশ্রী চণ্ডী*, দ্বিতীয় অধ্যায়, টীকা।) মাহিষ্মতী ও সিন্ধুদ্বীপ দুটি স্থান-নাম, মাহিষ্মতী হৈহয় বংশের রাজধানী ছিল। আমাদের আধুনিক চলচ্চিত্র-পুরাণ

‘বাহুবলী’-র কাল্পনিক ঘটনাস্থল। বিধান রায়ের ‘মানসকন্যা’ কল্যাণী শহরের মতো, বিপ্রচিত্তি-র কন্যা ‘মাহিষ্মতী’, পৌরাণিক বর্ণন-ভঙ্গিমায় তাঁর পত্তন করা প্রাচীন নগরের নাম হতেই পারে। বিপ্রচিত্তি সম্পর্কে যেটুকু তথ্য আমি উদ্ধার করতে পেরেছি তা এইরকম **হিরণ্যকশিপু**র ভগিনীর নাম **সিংহিকা**, তার সঙ্গে **দনু**র পুত্র অর্থাৎ দানব **বিপ্রচিত্তি**-র বিবাহ হয়। হিরণ্যকশিপু **দিতি**র পুত্র অর্থাৎ দৈত্য, প্রহ্লাদের পিতামহ, বিষ্ণু যাঁকে নৃসিংহ অবতারে বধ করেন। সমুদ্রমন্থনের পর যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি হিরণ্যকশিপুর সেনাপতি ছিলেন, আটবার যুদ্ধের পর নবম যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। **বিপ্রচিত্তি প্রথম দানব রাজা, তাঁর কন্যা মাহিষ্মতী**, পুত্র **নমুচি** যিনি ইন্দ্রকে পরাজিত করেন, (পুরাণে আমরা তিনজন নমুচির দেখা পাই, ইনি তৃতীয়, কশ্যপের পৌত্র) প্রথমে দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল। দেবাসুর যুদ্ধের সময় নমুচি ইন্দ্রের বল হরণ করেন, তারপর এই শর্তে মুক্তি দেন যে দিবসে বা রাত্রে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দিয়ে ইন্দ্র নমুচিকে বধ করবেন না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সমুদ্রফেনবৎ বজ্র দ্বারা ইন্দ্র গোধূলি বেলা নমুচিকে বধ করেন। নমুচির ছিন্ন মস্তক বন্ধুত্ব ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ইন্দ্রকে ধিক্কার দিয়েছিল। **রাহু** এবং **কেতু**-ও বিপ্রচিত্তির পুত্র। **ইল্বল** ও **বাতাপি**-ও বিপ্রচিত্তির পুত্র, যাদের মাতা সিংহিকা। হিরণ্যকশিপুর পুত্র **হিরণ্যাক্ষ**। হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে বেঁধে রসাতলে নিয়ে যান। **রসাতলে নিবাতকবচ ও কালকেয়-রা বাস করে**।

রসাতল বলতে যে ধারণাটা আমাদের মাথায় আসে, পৌরাণিক অর্থের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, সম্পূর্ণ উলটোও

বলা যেতে পারে। পৌরাণিক অধিকাংশ বিষয়ে আমাদের কিছু ভ্রান্ত আধুনিক ধারণা আছে যা অশিক্ষা প্রসূত। কারণ এগুলি আমরা রূপকথা শোনার মতো এমনি এমনি জেনে যাই। আর বুড়ো হবার পর সকলেরই একটু ধম্মে মতি হয় তখন দু-একটা পুরাণ কেনা হয়। বাদবাকিরা ধর্মগুরুদের মুখে শোনেন, তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায় অনুসারী বা সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হয়ে উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা দেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কিন্তু পুরাণকে 'হিস্ট্রি' বা ইতবৃত্ত হিসাবে বোঝবার চেষ্টা করতে গেলে, এইসব ধারণাগুলোকে যথোপযুক্ত পাঠের মাধ্যমে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি, নৃসিংহ অবতারের হিরণ্যকশিপুর হত্যার পর কনিষ্ঠ পুত্র **প্রহ্লাদ** রাজা হন, বিষ্ণুভক্ত হিসাবে। তারপর রাজা হন হিরণ্যাক্ষ পুত্র **অন্ধক**। সেই বংশে রুরুর পুত্র পরাক্রান্ত **দুর্গাসুর** বা **দুর্গমাসুর**-এর জন্ম।

নব পুরাণ: মহিষাসুর/হুদুড়দুর্গা

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে দুর্গ নামক অসুর এবং মানবের সকল দুর্গতি নাশ করিবার জন্যই দেবীর নাম দুর্গা (*প্রকৃতি খণ্ড* ৫৭ অধ্যায়)। দুর্গ তৈরি করবার বিদ্যা অবিসংবাদীভাবে তথাকথিত 'প্রাগ-আর্য' অসুরদের, যদি দুর্গা বা 'দুর্গী' (*তৈত্তিরীয় আরণ্যক* ১০.১.৭), দুর্গ হতে উদ্ভব হয়ে থাকেন তাহলে অধুনা রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে দলিত সমাজে যে অসুর উৎসব প্রচলিত হচ্ছে তার পুরাকাহিনিটা ভেবে দেখবার মতো। সেই কাহিনিতে অসুর অধিপতি হুদুড় দুর্গার সঙ্গে তার জাতিরই এক কন্যা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিয়ের

নামে তাঁকে বন্দি, ও অবশ করে। অস্ত্রহীন অবস্থায় শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে। অন্যমতে এই কন্যা আর্য জাতীয়। হুদুড় দুর্গাকে হত্যায় সহায়তা করার জন্য এই কন্যাকে বিদেশি শত্রুরা দুর্গা নামে অভিহিত করে। স্কন্দপুরাণের কাহিনির সঙ্গে এর মিল অনস্বীকার্য, এই অসুর উৎসব ইদানীংকালে দলিত আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে কিছুটা প্রচার লাভ করার পর বিতর্কিত হয়েছে, বিশেষত JNU-কে কেন্দ্র করে, দেবী দুর্গাকে একটি আপত্তিকর শব্দে অভিহিত করার কারণে। আমার মনে হয় এখানে কিছু শব্দের গোলযোগ রয়েছে, মানে আধুনিক অর্থ প্রযুক্ত হওয়ার ফলে এরকম ভুল বোঝার সৃষ্টি হয়েছে। শব্দটি রাঁড়ি, যা থেকে রান্ডি শব্দটা এখনও চালু, কিন্তু সাঁওতাল ভাষায় রাঁড়ি শব্দের অর্থ বিধবা, এমনকি বাংলা ভাষাতেও এই অর্থে প্রচলন ছিল।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-এ রাবণ যখন পুত্র মহীরাবণকে যুদ্ধের জন্য ডেকে পাঠান, তখন পূর্ব ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন—

পঞ্চবটী বনে বৈসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শূর্পণখা ভগ্নী গেলা তার দরশন।।
ভালোমতো জানো শূর্পণখার চরিত।
লোকধর্ম না মানে রাঁড়ি বলে বিপরীত।।
সেই রাঁড়ির নাক-কান কাটিলো লক্ষ্মণ।
[...] পাত্র লইয়া আমি ছিলাম লঙ্কাপুরী।
হেন কালে রান্ডি আইলো মোর বরাবরি।।

(সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হ্যালডেন সংগৃহীত পুথি অনুসারী *কৃত্তিবাসী রামায়ণ*, ভারবি প্রকাশন)

এক্ষেত্রে রাঁড়ি বা রান্ডি শব্দ দুটি তথাকথিত বর্তমানের 'চরিত্র'-বাচক অর্থে না ধরাই সমীচীন। কবি কল্পনায় রাবণ প্যাঁচে পড়ে খামোখা বোনকে গালি দিতেই পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে **শূর্পণখা** ছিলেন বিধবা, রাবণের হাতেই শূর্পণখার স্বমনোনীত স্বামী রসাতল নিবাসী **কালকেয় বংশীয় বিদ্যুৎজিহ্ব** নিহত হন। শূর্পণখার এই শত্রুপক্ষীয় পতি নির্বাচনে রাবণ প্রথমে খুব রেগে যান, তারপর মন্দোদরীর মধ্যস্থতায় মেনে নেন। একসময় রাবণ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে রসাতলে পৌঁছে বোনের সঙ্গে দেখা করতে বিদ্যুৎজিহ্বর বাড়িতে যান। কিন্তু বিদ্যুৎজিহ্বর শূর্পণখাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য ছিল রাবণকে হত্যা, তিনি রাবণকে আক্রমণ করলে রাবণ আত্মরক্ষার্থে বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করতে বাধ্য হন। 'রান্ডী' শব্দটা আমরা *মনসামঙ্গল*-এও পাই—

সনকার বচনে বেহুলা কোপে জ্বলে
যোড়হাত করিয়া শাশুড়ির আগে বলে
পাপকর্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী
বিয়ার রাত্রে মৈল স্বামী, হৈলাম কাঁচা রান্ডী।।

বেহুলা নিশ্চয়ই শব্দটি কোনো গালাগাল অর্থে নিজের সম্পর্কে ব্যবহার করেননি। এখানেও বিধবা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হুদুড় দুর্গার গল্পের বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর ক্ষেত্রেও এই শব্দটি বিধবা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। যাই হোক এ বিষয়ে আমার বেশি কিছু বক্তব্য নেই কারণ আগে শুনেছিলাম এই দিনগুলি অসুর উপজাতির কাছে শোকের দিন। এখন নতুন করে সেটিকে পালন করতে গেলে যথারীতি কালের নিয়মে উৎসব হয়ে দাঁড়াবে। তবে ছোটো থেকে দেখেছি দুর্গামূর্তি তৈরির জন্য

শুরুতে বেশ্যা দুয়ারের মাটি (কৃষ্ণনগরে মুক্তি-ডাক্তারের বাড়ির পাশের অধুনালুপ্ত 'গলি') নিয়ে আসা হত, এবিষয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যা হল, মানুষ তার সব অর্জিত পুণ্য ওখানে ত্যাগ করে বেশ্যা গৃহে প্রবেশ করে, এই ব্যাখ্যা নেহাতই আধুনিক, ভিক্টোরিয় ঔপনিবেশিক বাঙালির তৈরি সেটা বেশ বোঝা যায়। কারণ হিন্দু সভ্যতায় গণিকারা চিরকালই যথেষ্ট উচ্চস্থান পেয়েছেন এমনকি স্বর্গেও গণিকারা রয়েছেন, যাঁদের অপ্সরা বলা হয়। আর এই প্রথাটি যদি ওই ব্যাখ্যার সমকালীন হত, তাহলে প্রথাটি চালুই হত না। কোনোরকম সন-তারিখের জটিলতায় না-গেলেও মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করে দুর্গাপূজার অধিক প্রচলন হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে। তখনও যে এই বোকা-বোকা ঔপনিবেশিক শালীনতাবোধ বাঙালি জাতির মধ্যে তৈরি হয়নি তার কিছু প্রমাণ পূজাসংক্রান্ত বিষয়ে বলবার সময় ফিরে দেখব। তাই হতেই পারে এই প্রথার মাঝে কোনো গল্প লুকিয়ে আছে।

সমাজ-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ জড়িত রয়েছে বলে এই আধুনিক পুরাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন মনে হয়। অসুর উপজাতি সম্পর্কে আমি বিস্তারিত জেনেছিলাম রামায়ণ পড়াকালীন Verrier Elwin লিখিত *The Agaria* নামক একটা বই থেকে, সেখানে লেখক আগারিয়া বা অসুর উপজাতির লোকেরা যারা লৌহ-নিষ্কাশনের কাজ করত আদিম পদ্ধতিতে, তাদেরই সংস্কৃত সাহিত্যের দেবাসুর যুদ্ধের অসুর হিসাবে চিহ্নিত করেন, তাদের সমাজব্যবস্থা, মিথ, আচার-অনুষ্ঠান সমস্ত কিছু নিয়ে এটি একটি সম্পূর্ণ নৃতাত্ত্বিক গ্রন্থ। ১৯৪২-এ প্রকাশিত গ্রন্থটির সূচনায় লেখক, অনন্তপ্রসাদ ব্যানার্জি-শাস্ত্রীর লেখা একটি প্রবন্ধের

উল্লেখ করেন, যেখানে নাকি বলা হয়েছিল—পৌরাণিক সংগ্রামের ফলে অসুরেরা সিন্ধু অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারা মধ্যদেশ, দক্ষিণাঞ্চল, ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। অসুরদের প্রধান অংশ ছিল নাগগণ, তাদের পতনের সঙ্গে অসুরদের আধিপত্য শেষ হয়, তাদের বাসস্থানের নামের অবশেষ নাগপুর, ছোটোনাগপুর ইত্যাদি। বইটাতে আগারিয়া উপজাতির লোকগল্পে লোহাসুর, কয়লাসুর, অগ্ন্যাসুর এবং পদবি হিসাবে 'অসুর' শব্দ ব্যবহারকারী মানুষজনের কথা থাকলেও, হুদুড় দুর্গা বা দুর্গাসুরের কোনোই উল্লেখ ছিল না।

তারপর পিডিএফ-এর যুগে *The Asur: A Study of Primitive Iron-Smelters* নামে K. K. Leuva লিখিত একটি বই হাতে আসে। সেই বই থেকে আরও বেশ কিছু কথা জানতে পারি এই উপজাতি সম্পর্কে। সেখানেও হুদুড় দুর্গা সংক্রান্ত কিছু ছিল বলে মনে পড়ে না! সুহৃদকুমার ভৌমিক *আর্য রহস্য* নামক পুস্তিকায় অসুরদের এই পরিচয়কে সমর্থন করে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। অসুর উপজাতির দুর্গাপুজোর সময় শোকপালনের কথা জানতে পারি ২০০৮ নাগাদ, একটি সংবাদপত্রের ছোট্ট রিপোর্টে, যেখানে দিনাজপুরের এক গাঁয়ে বসবাসকারী কয়েকটি পরিবারের কথা বলা হয়েছিল। গ্রামটিকে অসুর গ্রাম নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ধীরে-ধীরে টুকরো-টাকরা অনেক রকম তথ্যের পরে 'মূলনিবাসী' নামে একটি সংগঠনের নাম শুনলাম। চরণ বেসরা নামে এক ভদ্রলোকের এই সংক্রান্ত ইন্টারভিউ দেখেছিলাম ইউটিউবে ২০১৪ নাগাদ। ২০১১ থেকে পুরুলিয়া জেলার

ফালাওড়া গ্রামের আদিবাসীরা অসুর উৎসব পালন করছেন, তার পর থেকে বিভিন্ন দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের সংগঠন এই উৎসব পালন করছেন। যেমন মালদায় 'মাজি পরগনা গাঁওতা' এবং 'মূলনিবাসী সমিতি'।

২৫ অক্টোবর ২০১৫, 'আনন্দবাজার' ডিজিটাল এডিশনে নিজস্ব সংবাদদাতার বয়ানে, 'পুজোয় মহিষাসুর স্মরণ' শিরোনামে —'চারদিকে যখন অসুরদলনী দুর্গার পুজো চলছিল, সেই সময় অন্য পুজো হল কাশীপুর থানার ভালাগোড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। বৃহস্পতিবার পূজিত হলেন হুদুড় দুর্গা'— বাই-লাইন নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়, সেখানে দেখা গেল—

'শিকার দিশম খেড়ওয়াল বীর লাকচার কমিটির তরফে অজিতপ্রসাদ হেমব্রমের কথায়, "দুর্গার হাতে নিহত হন আমাদের আদিপুরুষ হুদুড় দুর্গা। যিনি ঘোরাসুর বা মহিষাসুর নামেও পরিচিত। আমরা মনে করি নীতিহীন যুদ্ধে তাঁকে মারা হয়েছিল। তাতে ভারতের ভূমিপুত্র খেড়ওয়ালরা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। ঘোরাসুরকে এই যুদ্ধে পরাজিত করার পরে আর্যাবর্ত নামে আর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন আর্যপক্ষ বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছিল। সেই সময় সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, কুড়মি, মাহালি, কোড়া প্রভৃতি খেড়ওয়াল গোষ্ঠীর আদিবাসীরা বশ্যতা স্বীকার না করে নিজেদের নিজেদের মান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নারীর ছদ্মবেশে দাঁশাই নাচ, কাঠি নাচের মাধ্যমে অন্তরের দুঃখ নিয়ে আনন্দের অভিনয় করতে করতে সিন্ধু পাড় ছেড়ে আসম, কাছাড়, ওড়িশা, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ ভারতের বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল।"'

তারপর 'আয়নানগর' (মে ২০১৭) পত্রিকায় প্রকাশিত 'হুদুড় দুর্গা' নামে অজিতপ্রসাদ হেমব্রম-এর একটি সাক্ষাৎকার থেকে যা জেনেছি তা এইরকম—"খেরওয়ালদের বিশেষ উৎসব দাশানি, বলা যায় দুঃখের উৎসব। দুঃখের, কারণ তাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাচীনকালে খেরওয়ালদের এক মহান নেতা ছিলেন হুদুড় দুর্গা। তিনি আক্রমণকারী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। শত্রুরা যুদ্ধে জিততে না-পেরে অন্যায় ভাবে হুদুড় দুর্গাকে খুন করে, তাই এই উৎসব একপ্রকার শোক পালন। হুদুড় দুর্গাকেই এখন মহিষাসুর বলা হয়, তাঁর রাজত্বে কোনো অভাব ছিল না। প্রাচীন **চাইচম্পা** নগরে সকলে সুখে-শান্তিতে, বড়ো বড়ো বাড়িতে বাস করত। আর্যরা আক্রমণ করলে হুদুড় দুর্গা তাদের প্রতিহত করেন। তখন তারা ফন্দি আঁটে, তারা জানত খেরওয়ালরা কখনো মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না, এখনো নয়। তখন আর্যরা সেটাকে কাজে লাগায়—এক অপরূপ সুন্দরী আর্য রমণীকে পাঠিয়ে তার সঙ্গে হুদুড় দুর্গার বিবাহ দেয়, তারপর তার সহায়তায় হুদুড় দুর্গাকে হত্যা করে। চম্পানগরের সকলে পালিয়ে যায় প্রাণে বাঁচতে। এখন অনেকে মুর্মু-র মতো অসুর পদবি ব্যবহার করছে, তারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং ঝাড়খণ্ডে বেশি। ওই দিনগুলোতে মহিলাবেশে নাচের প্রথা বহুকাল ধরে চালু আছে, হুদুড় দুর্গার সময়ে দাঁশাই নাচ ছিল আনন্দ উৎসব, পরে শোকপালন।"

"নতুন করে অসুর উৎসব পালনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার কারণ, অসুর হুদুড় দুর্গাকে নিধনে সহায়তা করার

জন্যই সেই রমণীকে দুর্গা নামে আখ্যায়িত করা হয়। ভারতীয় মূলনিবাসীদের বীর যোদ্ধাকে নিধন করার আনন্দে আর্য সংস্কৃতির উত্তরসূরি ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্গোৎসবের নামে আনন্দে মেতে ওঠে। অপরদিকে সপ্তমীর দিন থেকে শোকের প্রতীক হিসাবে দাঁশাই নাচ বা ভুয়াং নাচের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় আদিবাসীদের শোকযাত্রা, আদিবাসী পুরুষেরা মহিলাদের পোশাকে রাস্তায় দাঁশাই নাচ ও গানের মাধ্যমে 'হায় হায়' করে তাদের বীরযোদ্ধা দলপতির স্মৃতিতে শোক প্রকাশ করে। তাই দাঁশাই গানের শুরু আর শেষে—হায় হায়—ব্যবহার হয়। দাঁশাই নাচে অংশ নিতে প্রতিটি পুরুষ রংবেরঙের কাপড় পরিধান করে, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে মহিলাবেশ ধারণ করে, আদিবাসী যোদ্ধারা যেভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেটিকে স্মরণ করে। ভারতের মূল বাসিন্দা আদিবাসীদের জীবনে অসুর দুর্গা ন্যায় পরায়ণ মহান যোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক শহিদ আর দুর্গা আর্য সংস্কৃতি তথা ব্রাহ্মণ্যবাদের ছল-কাপট্যের প্রতীক।"

'উদ্দীপন' নামে একটি ব্লগে শরদিন্দু উদ্দীপন ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭, লিখেছেন, "দেবীপুরাণে যে ঘোড়াসুরের বর্ণনা পাওয়া যায় তা হুদুড়দুর্গাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সাবর্ণি' নামে অষ্টম মনুর মন্বন্তরের সময় যখন পুরন্দর দেবতাদের ইন্দ্র হয়েছিলেন (মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮০ অঃ) সেই সময় রম্ভাসুরের পুত্র ঘোড়াসুর কুশদীপের অধিপতি ছিলেন। সেই ঘোড়াসুরই মহিষাসুর নামে খ্যাত (দেবীপুরাণ, ১ম অঃ)। তিনি নিজে বাহুবলে জম্বুদ্বীপ, ক্রোঞ্চদ্বীপ, শাল্মদ্বীপ, পুস্করদ্বীপ, মানসদ্বীপ (স্বর্গ) ও নাগরাজ

(পাতাল) জয় করে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের অধিপতি ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন বলবান, বীর্যবান, বুদ্ধিমান, ও সর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী তেমনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, সংযমী, বিলাসহীন, ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবতাবাদের আদর্শে প্রজাহিতৈষী। প্রজাগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তার নাম বুকের মধ্যে খোদাই করে রাখত (দেবী পুরাণ-২ ও ১৬ তম অঃ)। পরস্ত্রীকে তিনি সর্বদা কন্যা ও মাতা হিসেবে বিবেচনা করতেন। (দেবী পুরাণ ষোড়শ অধ্যায় শ্লোক নং ২-১২)"

[...] "ভীল আদিবাসীরা দাবী করেন দুর্গা তাদের মেয়ে। দেবতারা তাকে শিবিরে নিয়ে গিয়ে মহিষাসুরকে হত্যা করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়। দেবীর আর এক নাম চণ্ডী। হাঁড়ি সম্প্রদায়ের দাবী চণ্ডী তাঁদের মেয়ে। দেবতারা তাকে দিয়ে তাঁদেরই রাজাকে হত্যা করে। এখনো হাঁড়ি সম্প্রদায়ের চণ্ডী পূজায় কোন ব্রাহ্মণ ব্যবহার করা হয় না।"

"সাঁওতালরা দাঁশায় গানের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেন যে হুদুড়দুর্গা বা মহিষাসুরকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে ইন্দ্র চাইচম্পাগড় বা হরপ্পা থেকে আদিবাসীদের বিতাড়িত করেন। তাঁরা প্রাণ বাঁচাতে নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে "ইয়ায় নায়ে দিশম চাম্পা" বা সপ্ত নদীর দেশ হরপ্পা থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশ হারানোর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আজও তাঁরা বুক চাপড়ে ও হায়রে-ও হায়রে আওয়াজ করে ভুয়াং নাচের মাধ্যমে তাঁদের রাজাকে খুঁজে বেড়ায়। দেবী দুর্গার হাতে হুদুড়দুর্গা বা মহিষাসুরের হত্যার কাহিনী এভাবেই লোকায়ত হয়ে আছে আদিবাসীদের মধ্যে। আদিবাসী সত্তায় রাজত্ব হারানোর স্মৃতি এখনও সমান ভাবেই বর্তমান।"

সব পুরাকাহিনি লোককাহিনির মতোই এরও বহু রকমফের শোনা যাচ্ছে তবে এই অনুষ্ঠান মূলত নব্য হিংস্র ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের রাজনীতির বিরুদ্ধে দলিত আদিবাসী অনগ্রসরদের প্রতিবাদ, যাঁরা আজকাল উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঘনঘন মব-লিঞ্চিং-এর শিকার হচ্ছেন। ওই হিন্দুত্ববাদীদের এক শাখা বঙ্গদেশে 'জন্মভিত্তিক জাতি ও বর্ণ'র বদলে সনাতন কর্মভিত্তিক বর্ণ বিভাজনের পুনঃপ্রবর্তনের গল্প শুনিয়ে অনগ্রসর ও তালিকাভুক্ত জাতিদের ভোট জমা করছেন, আর ওদিকে লোকসভার স্পিকার বামুনেরা জন্মগতভাবেই উচ্চাসনের দাবিদার বলে মতপ্রকাশ করছেন, বক্তৃতা ও সামাজিক মাধ্যমে!

পূর্বেল্লিখিত উদ্দীপন নামক ব্লগে 'ঘোড়াসুর' নাম থাকলেও, দেবীপুরাণ-এ অসুরের নামটি ঘোরাসুর, যে উল্লেখ এবং কাহিনিটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। বিশদে উল্লেখ জরুরি।

দেবীপুরাণ-এ ১ থেকে ২০ অধ্যায় **ঘোরাসুর**-এর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কুশদ্বীপের চন্দ্রশোভাপুর ছিল তাঁর রাজধানী। ঘোরাসুর ত্রিভুবনবিজয়ী সৎ সদাচারী পরমজ্ঞানী প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন বলে দেবতাদের রাজনৈতিক বদবুদ্ধিতে নারদ মুনি এসে তাঁকে ভোগ, যথা নিত্য ষোড়শী নারী সম্ভোগ জাতীয় কুমন্ত্রণা দেন। তাতে সফল না-হয়ে প্রজাদের উপকারের দোহাই দিয়ে বৃদ্ধা পত্নী সঙ্গম না-করে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, তারপর ঘোরাসুরকে সৈন্যসামন্তসহ সেখানে নিয়ে যান। সেখানে নারদ দেবীকে বলেন ঘোরাসুরকে হত্যা করতে।

দেখা যাচ্ছে হুদুড় দুর্গা আর দেবী দুর্গার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌরাণিক গল্প এটাই। দেবীপুরাণ-এর চতুর্থ অধ্যায়ে বিষ্ণু

ঘোরাসুরের পূর্বকাহিনি ব্যক্ত করছেন—আগে তিনি ছিলেন **দুন্দুভি** নামক এক অসুর, **উমা**কে কামনা করলে **শিব** তাকে ভস্ম করেন। আর সেই ভস্ম দেবীর গায়ে মাখিয়ে দেন, সেই ভস্ম একটি **বর্ত্তি**(!!)-**র আদল নিয়ে** আবার দেবীকে কামনা করলে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মর্তে জন্মাবার অভিশাপ দেন। শত্রুকে শেষ না-করে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখায় শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবীকে 'মন্দবুদ্ধে সদা বালে স্ত্রীস্বভাবেন' বলে তিরস্কার করেন কারণ তাঁকেই আবার মর্তে গিয়ে এই অসুরকে মারতে হবে। (সাদা বাঙলায় ভাবানুবাদ করলে 'বোকা মেয়েছেলে সাধে কি এগারো হাত শাড়িতে কাছা হয় না' এইরকম গোছের কিছু হয়তো)। এতে দেবী রেগেচটে বলে ওঠেন মর্তে জন্মে বিষ্ণুভক্ত হয়ে এই অসুর ত্রিভুবন জয়ী হবে, দেবরাজ ইন্দ্রকেও একে মেনে চলতে হবে, কেউ হারাতে পারবে না, তুমিও না। এই কাণ্ডে স্বাভাবিক ভাবেই শিব আরও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবীকে অভিশাপ দেন, তাহলে তোমাকেও মর্তে জন্মাতে হবে আর তখনও এই অসুর তোমায় বিয়ে করতে যাবে। দেবী তখন বলেন, তাহলে কাউকে লাগবে না, তিনি নিজেই সিংহবাহিনী হয়ে অসুরকে হত্যা করবেন। সেই অসুর হলেন ঘোরাসুর।

বাবা-মায়ের ঝগড়ায় সন্তানদের কান দিতে নেই আর রৌরবের ভয়ে কথ্য বাঙলায় কাণ্ডটা বিস্তারিত না-লেখাই ভালো, পুরাণপাঠ সর্ব্বদাই পুণ্যের কাজ তার উপর এমন গপ্পো, এই অংশ সরাসরি পড়ে নেওয়া যাক্ দেবীপুরাণ-এর পাতা থেকে। প্রাপ্তবয়স্ক প্রাপ্তমনস্ক পাঠক নিজ অভিজ্ঞতানুযায়ী কল্পনায় তর্জমা করে নেবেন।

বিষ্ণুরুবাচ।

আসীদ্ দুন্দুভিনামাসা বসুরাাথাং প্রভূত্তমঃ ।
তেন জিতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবরপ্রভাবতঃ ॥৫৮
অজেয়ো-ব্রহ্ম-সূর্য্যাণাং যমস্যাস্মাকমেব চ।
তা নির্জ্জিত্য দেবাংস্তু স্বর্গাচ্চ্যবিয়তে কিল॥৫৯
তাবৎ তস্য মহাবাহো ঈশঃ শৈলঙ্গমোহভবৎ।
তদা পশ্যতি দেবেশীং * শঙ্করস্য তনুস্থিতাম ।
বামভাগে মহারূপাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্॥ ৬০
তাং দৃষ্ট্বা ক্ষোভমাপন্নঃ কামবিহ্বলচেতনঃ।
দেবীং সমুদ্যতো বক্তুং দেবেন চ স ঈক্ষিতঃ ॥৬১

বিষ্ণু, ইন্দ্রের কথা শুনিয়া কৃপা করিয়া সহাস্যে বলিলেন,— আমার নিকটে তোমাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু হে দেবেন্দ্র! যদিও উমা-দেহার্দ্ধধারী দেবদেব ঈশ্বর, তোমার পক্ষে আসিয়াছেন, তথাপি এ যুদ্ধ তোমার পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেননা এ বিষয়ে বিশেষ কারণ আছে, তাহা শুন। পূর্ব্বে দুন্দুভি নামে অসুরদিগের এক মহারাজ ছিল, ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দুন্দুভি, সূর্য্য, অগ্নি, যম এবং আমাদিগের অজেয় হইয়াছিল, সকল দেবতাকেই সে পরাজিত করিল। দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট করিল। হে মহাবাহো! এই সময়ে শিব পর্ব্বতবিহার করিতেছিলেন, তখন দুন্দুভি শঙ্করশরীরের বামভাগে অবস্থিতা সর্ব্বদেব-নমস্কৃত মহারূপবতী উমাকে অবলোকন করিয়া ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইয়া বিহ্বলচিত্তে সেই দেবীকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইবামাত্র, মহাদেব তাহার

ততঃ স সহসা দগ্ধো নেত্রজেনানলেন তু ।
দেবদেবশ্য কোপেন দানবো ভস্মতাং গতঃ ॥৬২
সায়ুধঃ সরথঃ ক্রূরঃ সপাদাতিঃ সবাহনঃ।
সহসা ভস্মীভূতং তং দৃষ্ট্বা দেবস্ত্রিলোচনঃ।। ৬৩
রক্তপীতাসিতশ্যামা ভস্মাদ্ধরি তমেব চ।
গৃহীত্বা সিতভস্মেন দেবীঞ্চাপ্যবধূনয়ৎ ॥ ৬৪
তস্য হস্তকরাস্ফালা...নাবসানতঃ।
উদ্ধৃতা মহতী বর্ত্তি সর্ব্বর্ণকভূষিতা। ৬৫
তাং তপন্তীং সমালোক্য উমাং দেবনমস্কৃতাম্।
তস্মিন্ সমুদ্ভবচ্ছায়া সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা। ৬৬
দ্বিতীয়ং দেবভাগস্তু যাচমানা মহাবলা।
তদা উমা দদৌ শাপং স্মৃত্বা ঘোরং মহাসুরম্।। ৬৭

প্রতি রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনন্তর, ক্রূরপ্রকৃতি দুন্দুভি দানব, শিবের রোষদৃষ্টিসম্ভুত অনলে, অস্ত্র-শস্ত্র রথ পদাতি এবং বাহন সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইল। ত্রিলোচন দেব, দুন্দুভি দানবকে সহসা ভস্মীভূত অবলোকন করিয়া তাহার রক্ত, পীত, সিত, শ্যামল ভস্ম হইতে সত্বর শুক্ল ভস্ম গ্রহণ করিয়া দেবীকে তাহা মাখাইতে লাগিলেন। ভস্ম মাখান শেষ হইলে, শিবের করঘর্ষণে একটা ভস্মের বড় বর্ত্তি (বাতি) উদ্‌বৃত্ত হইল। তাহা নানাবর্ণে সুশোভিত হইল। সেই বর্ত্তিতে সর্ব্ব লক্ষণ-লক্ষিত দানবমূর্ত্তি প্রার্দুভূত হইল। মহাবলশালিনী সে মূর্ত্তিও শিবের বামভাগের অর্থাৎ উমার জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, দেব-নমস্কৃতা উমা তাহা দেখিয়া সেই ঘোর মহাসুরকে স্মরণ করিয়া দারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,— রে

গচ্ছ পাপ দুরাচার ভূতলং ত্বং মহাবল।
তথারূপো ভবেদেঘারো নীলমেঘসমপ্রভঃ ॥ ৬৮
মহারূপো ভয়ং দত্ত্বা সসুরাসুররক্ষসাম্।
দেবেন তং তদা দৃষ্ট্বা। কিমেতদ্ ভবতীকৃতম্।
স এব নির্জ্জিতঃ শত্রুরস্মাকঃ বর্ধমুদ্যতঃ॥৬৯
ন যুক্তং শত্রুপক্ষস্য বৃদ্ধিং দাতুং কদাচন।
যশ্চ কারণদ্রব্যাণাং সবিশেষং কৃতং মুদা।
মোচতে কৃপয়া মূঢ়ঃ স এব নিধনং ব্রজেৎ। ৭০
নিপাত্য সাখিলং সর্ব্বং মূলং যস্য ন খন্যতে।
স এব স্যাদ্ বলী ভূয়ো বদরী ইব শোভতে ॥৭১
তথা ত্বমপি দুর্ব্বদ্ধে মমায়ং বিনিপাতিতঃ।
দেবানাং বিঘ্নকর্ত্তা চ ঋষি-ব্রাহ্মণত্রাসকঃ।। ৭২

মহাবল। পাপিষ্ঠ দুরাচার! তুই মর্ত্যলোকে পতিত হ। নীলমেঘ সদৃশ প্রভাসম্পন্ন ঘোর দৈত্য তদ্রূপেই পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। তাহার রূপ দেখিয়া দেব, দানব, কি রাক্ষস — সকলেরই ভয় হইয়াছিল। শিব তাহা দেখিয়া বলিলেন, তুমি এ কি করিলে! সেই শত্রুকে একেবারে ধ্বংস করিলেই হইত। সেই পরাজিত শত্রুই এখন আমাদের বধের জন্য উদ্যত হইয়াছে। শত্রুপক্ষের বৃদ্ধি হইতে দেওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি কৃপাবশত শত্রুর শেষ পরিত্যাগ করে, সেই মূঢ় নিশ্চয় নিধন প্রাপ্ত হয়। সমুদয় বিনষ্ট হইলেও যাহার মূলোৎপাটন করা না হয়, শাদ্বল ভূমিতে মূলমাত্রাবিশিষ্ট বদরীবৃক্ষের ন্যায়, কালক্রমে তাহা সুপ্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে। তুমিও দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই দেব্বিঘ্নকর্ত্তা, ঋষিব্রাহ্মণত্রাসকারী অসুরের বধের ভার আমার উপরেই নিক্ষেপ করিলে। দেবদ্বিজগণের শত্রুপক্ষ বাড়ান কদাচিৎ উচিত নহে। হে

ন যুক্তং দ্বিজদেবানাং শত্রুবর্গস্য বর্দ্ধনম্ ।
মন্দবুদ্ধে সদা বালে স্ত্রীস্বভাবেন বর্ত্তসে। ৭৩
ইত্যুক্তা শম্ভুনা দেবী ক্রুদ্ধা তমদলোক্য সা ।
মদ্ভক্তিপরমো ভূত্বা সর্ব্বদেবান্ জয়িষ্যতি ॥ ৭৪
বিষ্ণুভাবঃ পরো হ্যেষ অবধ্যোহয়ং ভবিষ্যতি।
কুশদ্বীপপুরাবাসী চন্দ্রশোভাং ভবিষ্যতি ॥ ৭৫
সপ্ত দ্বীপাঃ সপাতালাঃ সপ্ত লোকাঃ সবাসবাঃ।
এতদাজ্ঞাকরা ভূতা অজেয়োহরং ভবিষ্যতি ॥৭৬
নিশম্য বচনং দেব্যা উন্মার্গগতিভাষিতম্।
শশাপ রোষর্মাবিশ্য ত্বঞ্চ মর্ত্ত্যং গমিষ্যসি।
তত্র চৈষ দুরাচারঃ পতিত্ব যাচয়িষ্যতি॥ ৭৭
তথা ক্রোধানলাদীপ্তা সা শপেতালুরাধিপম্।
নীলমেঘনিভাকারং যমাহিষমিবাপরম্।

মন্দবুদ্ধে! বালে! স্ত্রীলোকের স্বভাব তোমাতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। ৭৩।। শিব এই কথা বলিলে ভগবতী বড়ই ক্রুদ্ধা হইলেন, অনন্তর তিনি সেই অঙ্কুবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—এই অসুর, বিষ্ণু-ভক্তিবলে, সকল দেবগণকে জয় করিবে এবং অবধ্য হইবে। কুশদ্বীপের চন্দশোভাপুরে ইহার বাসস্থান হইবে। সপ্তদ্বীপা বসুমতী, সপ্তপাতাল এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত সপ্তলোক ইহার আজ্ঞাকর হইবে। এই অসুর, অজেয় হইবে। শিব, ক্রোধপরতন্ত্রা দেবীর এই অসুরোন্নতিকর অনুচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে দেবীকে অভিশাপ দিলেন, তুমিও মর্ত্ত্যবাসিনী হইবে, তখন এই দুরাচার দৈত্য তোমার পতি হইতে উদ্যত হইবে। তখন দেবী, ক্রোধে প্রজ্বলিতা ও আরক্তমুখী হইয়া, সেই অসুরেন্দ্রকে শাপ দিলেন,—

ক্রীড়ামনি হনিষ্যামি পঞ্চাননব্যবস্থিতা॥ ৭৮
উবাচ কৃপিতা দেবী দেবোঽপি চ তথৈব তাম্।
এব পূর্ব্বং সুরাধাক্ষ শম্ভুনা 'বজ্রনির্ম্মিতঃ॥ ৭৯
দুন্দভের্দেহতো ভূত্বা মম ভক্তিপরায়ণঃ।
চন্দ্রশোভাপুরবাসী মদীয়ার্চ্চাসদ্যোজাতঃ ॥ ৮০
তস্যেদং শাসনং প্রাপ্তং ব্রাহ্মৈরপি সুহঃসহম্।
কিং পুনঃ সর্ব্বযত্নেন সবলো যদি দানবঃ॥ ৮১
আগুতো ঘোরনামাসৌ রুদ্রাদীনপি সংহরেৎ।
তচ্ছ্রুত্বা তু হরের্বাক্যং কিং করোমি প্রভো বদ।। ৮২
ত্বয়া দত্তং মম স্বর্গং যজ্ঞাঃ সর্ব্বাশ্চ রক্ষিতাঃ।
ইন্দ্রাণাং ত্বং প্রভুঃ স্বামী দেবানাং ত্বঞ্চ পালকঃ।। ৮৩
ইত্যুক্তে বদতে বিষ্ণুঃ শৃণ শক্র সমাহিতঃ।
তত্রাগতো মহাবুদ্ধির্বাচস্পতিবৃহস্পতিঃ ॥ ৮৪ ॥ .

(পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত *দেবীপুরাণ* (১৩৩৪) পৃ ২১-২২)

এমন হইলে আমি 'সিংহারূঢ়া হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে, অপর যমের ন্যায়, নীল-মেঘসঙ্কাশ এই দৈত্যকে বিনষ্ট করিব। এইরূপে, শিব-কোপিতা দেবী অসুরকে অভিশাপ দিলেন, শিবও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে অভিশাপ দিলেন। হে সুরেন্দ্র! **শিবকর্ত্তৃক ভস্মদ্বারা নির্ম্মিত এবং দুন্দুভির দেহ-সম্ভূত, চন্দ্রশোভাপুরবাসী এই অসুর আমার ভক্ত এবং আমার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। তাহার আদেশ ব্রাহ্মণদিগেরও পালনীয়।** এখন ত সেই ঘোর দৈত্য, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সর্ব্বপ্রকার যত্নে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এখন সে রুদ্রাদিকেও সংহার করিতে পারে।

দেবীপুরাণ থেকে উপজীব্য এই যে, যেখানে স্বয়ং শিব, দেবীকে 'মন্দবুদ্ধে সদা বালে স্ত্রীস্বভাবেন বর্ত্তসে!' বলে ভর্ৎসনা করছেন, তার আগে রেগেমেগে অসুরের ভস্ম নিয়ে গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে ঘোরাসুর বা মহিষাসুরের এই দুর্গাকে বিয়ে করতে চাওয়ার ব্যাপারে দেবীর কোনো ভূমিকা নেই সেটা বলা যাবে না, তাই নবগঠিত হুদুড়দুর্গা-পুরাণকে এক-তরফা দোষ দেওয়া চলে না; অসুরের সাথে তাঁকে জড়িয়ে বাজে কথা নতুন শুরু হয়নি—তাঁর সতীন আর সম্পর্কিত মেয়ে দুজনেই অন্তত শ-তিনেক বছর আগে পাতি বাঙলা ভাষায় তাঁকে নিয়ে এবিষয়ে কুৎসা করেছেন! জগজ্জীবনের *মনসামঙ্গল*-এ গঙ্গা এবং মনসা দুজনেই দুর্গাকে **অসুরভাতার** বলে গাল পেড়েছেন। কলিকাতা বিশ্বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত ***কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল*** (১৯৬০), পুস্তকের পৃষ্ঠা ৭০-এ দেখা যাবে—

গঙ্গা বোলে দুর্গা তোর নিস্ফল জীবন।
তুমার অসুর ছিল ভাতার কেমন।।

এবং পৃষ্ঠা ৩০৬-এ—

দুর্গা বলে কি বলিলে ঢেট মুরূদারি।
তোর মত নই আমি ঢেমনভাতারি।।
পদ্মা বোলে কহিলে উকুটা যায় যায়।
কারো হেন নাহি করি অসুর ভাতার।।
দুর্গা বোলে অসুর মারিনু বাহুবলে।
তর হেন নাহি ধরি বাপের আঁচল।।

মনসামঙ্গল নিয়ে বেশ কয়েকবছর ধরে পড়াশোনা করলেও এখনও পর্যন্ত অন্য কোনো কবির রচিত *মনসামঙ্গল*-এ দেবীদের ঝগড়াকালে এই উল্লেখ পাইনি। জগজ্জীবন উত্তরবঙ্গের কবি, দিনাজপুরের কুচিয়ামোড়ে ছিল তাঁর বাস, আর যে অসুরগ্রামের শোকের কথা প্রথম শুনেছি সেটিও দিনাজপুরের কোথাও অবস্থিত! নাঃ, এসব থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না ঠিকই, কিন্তু বাঙালি চিরকাল বিশ্বাস করে, যা রটে তার কিছু তো ঘটে বটে। আর তাহলেই যথেষ্ট কেলো।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রজাতির হিন্দুবাদীরা হুদুড়দুর্গার গল্পটাকে স্রেফ আধুনিক 'আর্বান মাকু ঘাওরামি' হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তার মাঝে আংশিক সত্য হয়তো আছে, কিন্তু বহুকাল আগে ডি ডি কোসাম্বির *প্রাচীন ভারত কি সংস্কৃতি আউর সভ্যতা* নামক বইয়ে (রাজকমল প্রকাশন) মহিষাসুর প্রসঙ্গে পাই—

মহিষ-অসুর (**মাসোবা**) হল কৃষকের দেবতা যা সমগ্র অঞ্চলে (দাক্ষিণাত্যে) সাধারণ, যদিও প্রতিটি কৃষকের দ্বারা বিবিধ হয়ে ওঠেন।

"[...] আমাদের উপকূলের কাছাকাছি পর্বতশ্রেণীতে গবাদি পশু, লবণ, উপকূলে প্রবেশাধিকার, পাথরের হাতিয়ার, আগুন নিয়ন্ত্রণ, সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পণ্য (শিকারের পাশাপাশি সবজি) রয়েছে। দাক্ষিণাত্যে ইতিহাসের মঞ্চ তৈরি হয়ে ছিল, যেটি শুরু হবে যখন আদিবাসীরা আগুনের মাধ্যমে 'লাল মাটি' থেকে লোহা বের করতে শিখবে। মূল উদ্দীপক ও কৌশল যে উত্তর থেকে এসেছে তা পরে দেখানো হয়েছে। তবে প্রাচীনতম পশুপালকদের উত্তরের সাথেও কিছু সম্পর্ক ছিল

কিনা তা জানা যায়নি। তাদের ট্র্যাকগুলি উপদ্বীপ জুড়ে, দক্ষিণের প্রধান নদী উপত্যকাগুলি উপরে এবং নীচে চলে গেছে। শেষ তরঙ্গগুলি মেগালিথিক কাল্ট স্পটগুলিকে তাদের নিজস্ব হিসাবে পুনরায় ব্যবহার করেছে, যেখানে আধুনিক গ্রামবাসীরা এখনও দেবতাদের পূজা করে থাকে; কিন্তু পশুপালক (গাভালি) লোকেরা যারা বর্তমান দেবতাদের নিয়ে এসেছিল তারা মূল মেগালিথগুলি তৈরি করেনি, শুধুমাত্র তাদের ধর্ম বা কবরের জন্য খোদাই করা পাথরের সাথে মেগালিথিক উপাদানগুলিকে পুনরায় ব্যবহার করেছিল। তাদের পুরুষ দেবতা, পরে **মাসোবা** বা তার সমতুল্য হয়ে ওঠে, তার মূলত কোন সহধর্মিণী ছিল না এবং কিছু সময়ের জন্য খাদ্য-সংগ্রাহকদের পূর্ব্বর্তী মাতৃদেবীর সাথে বিরোধ ছিল। তবে শীঘ্রই দুটি দল একত্রিত হয় এবং দেবতারা সেই অনুসারে পরস্পর বিবাহিত হয়। কখনও কখনও, হয়তো কোনও অশিষ্ট মন্দিরে দেবীকে **মহিষ-অসুর মাসোবা**কে পিষে ফেলতে দেখা যায় যখন ৪০০ মিটার দূরে তিনি সামান্য পরিবর্তিত নামে একই মাসোবাকে বিয়ে করেন। এর ব্রাহ্মণ্য প্রতিফলন হল পার্বতী শিবের সহধর্মিণী, কিন্তু মহিষাসুরকে চূর্ণ করেন; আবার কখনও তিনি শিবকে পদদলিত করার বিপরীত মূর্তিতে ফিরে আসেন। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত তিনমুখী আদি শিবের সিলটিতে তাঁর শিরস্ত্রাণের অংশ হিসাবে মহিষের শিং রয়েছে।"

"প্রাগৈতিহাসিক টিকে থাকা বিষয়গুলো যা উৎপাদনের মাধ্যম এবং ধর্মীয় উপকাঠামো উভয়কেই প্রভাবিত করে তা সাম্প্রতি চিহ্নিত হচ্ছে। দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের সময়েও প্রাক-ইতিহাসের অদ্ভুত টিকে থাকা এবং সম্প্রসারণ অন্য কোনো

দেশের ক্ষেত্রে এতটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। এটি ভারতের বিশেষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক চরিত্র। বিবর্তনের ধারা আজকের জটিল ভারতীয় সমাজে তার স্পষ্ট, অনপনীয় চিহ্ন রেখে গেছে।”

অসুর-কাহানি

The Agaria গ্রন্থে অসুর উপজাতির প্রায় সমস্ত লোককথা একত্রিত ও বিশ্লেষণ করে ভেরিয়ের এল্যুইন বলেন, তাঁর ধারণা, “প্রাচীন অসুর উপজাতি বিহারে মুন্ডা রাজ্য আক্রমণ করে। মুন্ডারা তাদের প্রতিহত করে দেবতা **সিঙ্গা-বোঙ্গা**-র সাহায্যে এবং বিহার থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন অসুররা পশ্চিম ও উত্তরে ছড়িয়ে পড়ে—সরগুজা, উদয়পুর হয়ে বিলাসপুরের উত্তরে। একটি দুর্বল শাখা রাইপুর পেরিয়ে মৈকাল পাহাড়ে পৌঁছে অপর্যাপ্ত আকরিক লোহার সন্ধান পেয়ে সেখানে বসতি স্থাপন করে।” লোককথাগুলিতে হুদুড় দুর্গার কোনো উল্লেখ নেই, আছে **লোগুন্তি রাজা**র হৃত রাজ্য **চাইচম্পানগর**-এর কথা। কে কে লুভা *The Asur* গ্রন্থে লোহার-অসুরদের লোককথা ‘অসুর কাহানি’ পর্যালোচনা করে একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। অসুর-কাহানি বা অসুরদের পুরাকাহিনিটির মধ্যে অসুর ও মুন্ডাদের মধ্যে বিরোধের ঘটনা পাওয়া যাবে, কিন্তু মুন্ডা, ওঁরাও, বীরহর বা অন্যান্য উপজাতিও যখন গল্পটি বলে, তখন দেখা যায় হিন্দু পুরাণের মতোই মুন্ডাদের সর্বোচ্চ দেবতা সিঙ্গা-বোঙ্গাও অসুরদের হত্যা করতে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন! অসুরদের জবানিতে সিঙ্গা-বোঙ্গার বদলে **ধরম রাজা** কাণ্ডটি ঘটান, এবং শেষে চাষাবাদের বিদ্যা শিখিয়ে যান। গল্পটা সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে

Encyclopaedia Mundarica ফার্স্ট ভলুমে, আর শরৎচন্দ্র রায়-এর *The Mundas and Their Country* নামক বইতে। অতি-সংক্ষেপে 'অসুর কাহানি'টি এইরকম—আদিকালে সিঙ্গা-বোঙ্গা তার বউয়ের সঙ্গে স্বর্গে সোনার সিংহাসনে বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর খুব গরম লাগল আর তখনই অনেক পশুপাখি এসে নালিশ করল অসুরদের চুল্লির গরমে পৃথিবী এত গরম হয়ে গেছে যে তারা আর টিকতে পারছে না, খাবার নেই জল শুকিয়ে গেছে। সিঙ্গা-বোঙ্গা রেগে গিয়ে তরোয়াল বার করে বললেন, এক্ষুনি অসুরদের মেরে ফেলব। তার বউ বলল, তুমি একা কিছুতেই ওদের সঙ্গে পারবে না, তার চাইতে রাজনীতি আর চাতুরি করো। তখন সিঙ্গা-বোঙ্গা দাঁড়কাক আর চিলকে অসুরদের কাছে দূত করে পাঠালেন। তারা গিয়ে অসুরদের বলল সিঙ্গা-বোঙ্গা বলেছেন, তারা যদি দিনের বেলা চুল্লি জ্বালায় তাহলে যেন রাতের বেলা বন্ধ রাখে, আর রাতে জ্বালালে দিনের বেলা। পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে। তাই শুনে অসুররা হেসে বলল, আমরা নিজেরাই সিঙ্গা-বোঙ্গা, আমরা কারো আদেশ মানি না, আমাদের চেয়ে বড়ো কেউ নেই, এই বলে তারা দাঁড়কাক আর চিলের দিকে গরম কাঠ-কয়লা ছুঁড়ে দিল। তারপর সিঙ্গা-বোঙ্গা সোনাদিদি আর রূপাদিদি দুই শকুনকে পাঠাল, তাদের কথাও অসুররা শুনল না, মেরে তাড়িয়ে দিল। অসুররা যখন ভরতপাখি, কাক, বেনেবউ, কারোর কথাই শুনল না, সিঙ্গা-বোঙ্গা তখন নিজে এক সোনালি বাজের পিঠে চড়ে 'একাশিপিরি-তেরাশিবাড়ি'-তে এল, চালাকি করে জেতার জন্য। সেখানে এসে দেখল একটা ছেলে তোরো-কোরা, যার গোটা গায়ে চুলকানি। সিঙ্গা-বোঙ্গা ছেলেটার চুলের

মুঠি ধরে এমন ঝাঁকাল যে তার চামড়া খুলে চলে এল, নিজের গায়ে সেই চামড়া চাপিয়ে সিঙ্গা-বোঙ্গা অসুরদের কাছে গেল। অসুরদের কাছে এসে সে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়, চাকর হওয়ার জন্য, থাকা খাওয়া দিলেই হবে, তবু কেউ তাকে জায়গা দিল না। তখন দুই মুন্ডা বুড়োবুড়ি লুটকুম হারাম আর লুটকুম বুড়িয়া ছেলেটাকে তাদের কাছে রাখল। অসুর বাচ্চাদের সঙ্গে তোরো-কোরা একদিন ডিম নিয়ে গুলি খেলতে গেল, সবাই ভাবল ডিমগুলো ভেঙে যাবে কিন্তু উলটে অসুরদের লোহার গুলি ভেঙে গেল, তখন অসুর ছেলেরা লুটকুম হারাম আর লুটকুম বুড়িয়াকে বলল তাদের চাকর ছেলেটা ধানখেত পাখি আর শুয়োরদের জন্য ছেড়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে খেলছে। কিন্তু যখন তোরো-কোরা কতগুলো ধান নিয়ে মাদুরে, ঢেঁকির গর্তে, আর ঝুড়িতে রাখল, তারা এসে দেখল সবই চালে ভরে গেছে, লুটকুম হারাম আর লুটকুম বুড়িয়া ভাবল সে বুঝি অন্য কারো চাল চুরি করেছে। তখন ছেলেটা বলল ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সিঙ্গা-বোঙ্গা তাদের এই সব দিয়েছে। তারপরে একদিন অসুর ছেলেদের লোহার গুলিগুলো সে ভাতের গুলি দিয়ে ভেঙে দিল। এর কিছুদিন পরে অসুরদের লোহার জোগান ফুরিয়ে গেল, তারা তোরো-কোরা ছেলেটার আজব কেরামতির কথা শুনেছিল, তাই তাকে জিজ্ঞেস করল যে কী চুল্লিতে আহুতি দেওয়া যায়? সে তখন বলল একটা সাদা মুরগিকে আহুতি দিতে। তখন আবার তারা লোহা পেল। তারপরে যখন আবার লোহা শেষ হোল সে বলল একটা সাদা মাদি ছাগলকে চুল্লিতে দিতে, তারপরে আরও একবার বলল সাদা ভেড়া আহুতি দিতে। কিন্তু আবার

যখন লোহা পাওয়া গেল না, তখন তোরো-কোরা বলল একটা মানুষ আহুতি দিতে হবে। অসুররা তাদের নিজেদের কাউকে চুল্লিতে ঢোকাতে রাজি হল না। তখন সে বলল মুন্ডাদের গ্রামে গিয়ে একটা মানুষ আনতে। কিন্তু সেখানে তারা কাউকে দিতে রাজি হল না। তখন ওই তোরো-কোরা বলল, তাহলে আমাকেই তোমরা চুল্লিতে ঢুকিয়ে দাও। লুটকুম হারাম আর লুটকুম বুড়িয়া আপত্তি করলে তাদের বুঝিয়ে সে অসুরদের সঙ্গে চলে গেল। তারপর সে বলল নতুন করে বড়ো চুল্লি বানাতে, নতুন হাপর জুড়তে। চুল্লি জ্বালাতে বলে নিজে চুল্লির ভেতর ঢুকে গেল। তিনদিন পর চুল্লি নিভে গেলে, সে বেরিয়ে এল। তার চুলকুনি ভরা চামড়া ঝরে গেছে, হাতে অনেক সোনা আর মনিমুক্তো। লোভী অসুররা বলল, এসব কী আর আছে ভেতরে? সে বলল, অনেক-অনেক, চুল্লির ভেতরে গেলে তারাও পেতে পারে। তখন ছলনায় ভুলে সব অসুর পুরুষেরা চুল্লির ভেতর ঢুকে পড়ল, সিঙ্গা-বোঙ্গা মেয়েদের বলল চুল্লিটা চারদিক থেকে বন্ধ করে দিতে। তারপরে যখন ভেতর থেকে খুব চিৎকার-চেঁচামেচি আসতে শুরু করল, মেয়েরা জিজ্ঞেস করলে সিঙ্গা-বোঙ্গা বলল, ও কিছু না, ওরা সোনাদানা পেয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়েছে, আরও জোরে হাপর টানো। কিন্তু একটু পরেই চুল্লি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল, তখন বলল, ও কিছু-না বোকা মেয়ে, ওরা পান খেয়ে পিক ফেলছে, আরও জোরে হাপর টান। তারপরে যখন চুল্লি খুলে মেয়েরা দেখল শুধু পোড়া ছাই আর কিছু হাড়গোড় পড়ে আছে, খুব কাঁদতে-কাঁদতে চুল ছিঁড়ে বুক চাপড়ে মেয়েরা সিঙ্গা-বোঙ্গাকে অভিশাপ দিতে লাগল।

তখন সে গর্জন করে বলল, এত করে তোদের বারণ করলাম কথা শুনলি না, এবার থেকে আমায় মানবি। তখন মেয়েরা বলল মানব। আগে বল আমরা কী করে বাঁচব? তখন সিঙ্গা-বোঙ্গা বলল একটা গাছের নীচে গ্রামে এক মুন্ডা আর তার চেলা আছে, ওকে ডাক, ডেকে তোদের হয়ে পুজো করতে বল। এই বলে যখন সিঙ্গা-বোঙ্গা স্বর্গে উড়ে যাচ্ছিল অসুর মেয়েরা তাকে যেতে দেবে না বলে জামাকাপড় ধরে ঝুলে পড়ল। সিঙ্গা-বোঙ্গা ঝাঁকানি দিয়ে তাদের সারাদেশে ছড়িয়ে ফেলল। সব জায়গায় পড়ে তাদের আত্মারা **ভূত বোঙ্গা** হয়ে গেল। যারা টিলায় গিয়ে পড়ল তারা হল **বুরু বোঙ্গা**, যারা গভীর জলে পড়লো তারা হোল **ইকির বোঙ্গা**, যারা উঁচু পর্বতে গিয়ে পড়ল সে হল **মারাং-বুরু বোঙ্গা**, যারা উঁচু জমিতে পড়ল তারা হল **নাগে বোঙ্গা**, যারা সুন্দর বনে পড়ল তারা হোল **দাসুলি বোঙ্গা**। যারা ফাঁকা মাঠে বা ছায়াঘেরা ঝোপেঝাড়ে পড়ল তারা হল **চণ্ডী বোঙ্গা**। এই '**চণ্ডী বোঙ্গা**' নামটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত, কেননা আমরা বহুবিধ চণ্ডী-র দেখা পাই দেবী দুর্গাকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে।

নবগঠিত অসুর উৎসবের পুরাণেরও এখনই অনেক ভার্সন পাওয়া যাচ্ছে। যতদূর জানা আছে ২০১১ থেকে উৎসব শুরু হয়েছে, পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যেই এটিও 'বিশাল প্রাচীনত্ব' (!) লাভ করবে, আমাদের জাতিচরিত্র অনুযায়ী 'যুগ-যুগ' ধরে প্রচলিত তাই প্রামাণ্য হয়ে উঠবে। সাধারণভাবে 'প্রাচীনত্ব' সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা কত অসার, দুর্গাপুজোর প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে সাধারণ আলোচনায় বোঝা যায়। আমাদের

প্রাচীনত্বের দাবি করার স্বভাব এমনই যে বর্তমানের প্রচলিত দুর্গোৎসবকে ঐতিহাসিক কালবিচারে অর্বাচীন বললে অধিকাংশের প্রবল গোঁসা হয়। ফেসবুকে অনির্দিষ্ট গালাগালির বন্যা বয়ে যায় কোনো প্রমাণ ছাড়াই অথবা বড়োজোর মহিষ-মর্দিনীর পাথরের মূর্তি (চতুর্ভুজা বা অষ্টভুজা) দেখিয়ে পাল-সেন যুগ থেকেই প্রচলিত দাবি করা হয়ে থাকে। তাঁরা ভুলে যান বাঙালির দুর্গোৎসবের দেবী দশভুজা, পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত হয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসেন কাত্যায়নী মূর্তিতে, লক্ষ্মী সরস্বতী কীভাবে দুর্গার মেয়ে হয়ে গেলেন সে প্রশ্ন পুরাণের বদলে সিকেয় তুলে রাখলেও এটুকু বোঝা যায়, তিনি মহিষাসুর বধ করতে আসেন না, তিনিই যে অন্যরূপে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন তারই প্রতীক হিসেবে এই মূর্তি গঠিত হয়েছিল। পুরোনো মহিষমর্দিনী মূর্তির ধারায় মহিষাসুরমর্দিনী পুজো আজও ভিন্ন তিথিতে এই বঙ্গের নানা অঞ্চলে বহাল আছে, কৃষ্ণনগর কালনা ইত্যাদি তার প্রমাণ। সেইসব পুজোর বয়সও নেহাত কম নয়। একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি বিভিন্ন নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পূজিত হয়। মন্ত্রের মাধ্যমে সেগুলির কিছুটা সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। পুজোর প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে পূজাপদ্ধতি বিচারে আনা উচিত। আমাদের বর্তমানের দুর্গোৎসবের দুর্গার সপরিবার মূর্তি ও পূজাপদ্ধতির সৃষ্টিকাল কোনোভাবেই সপ্তদশ শতাব্দীর আগে নিয়ে যাওয়া যায় না এবং সেটুকুও জনশ্রুতি ও কিছু পারিবারিক দাবির ভিত্তিতে। বর্তমান মূর্তির অনুরূপ খুঁজতে গেলে উনিশ শতকের আগের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। দেবী বা চণ্ডী বা বকলমে মাতৃ আরাধনা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত ছিল, ভারতবর্ষে যে সেটা অবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে এই কথায় অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। মনে হয় না এরকম বুরবক খুঁজেও পাওয়া যাবে এদেশে, বেদ যদি উলটো কথা বলে তাহলেও না। কিন্তু আমাদের বর্তমানের দুর্গোৎসবকে ঠেলেঠুলে পালযুগে পাঠাবার কোন অর্থ নেই। পুরনো হলেই সেটা উচ্চমানের হয়ে যায় এই অদ্ভুতুড়ে ইউটোপিক ধারণার কোনো যুক্তি নেই (বোকা বোকা হিন্দুত্বের ধারণা যার মূল এবং মুসলমান শাসনকালকে অস্বীকার করবার মৌলবাদী প্রকাশ)। আর মূর্তির আদল দেখে বয়স নির্ণয় এক প্রবল গোলমেলে শিল্পবোধের পরিচয়, অর্বাচীনকালে 'পাল-সেন' যুগের মূর্তির আদল অনুসরণ করা যাবে না, শিল্পীদের এরকম 'মায়ের দিব্যি' বা ফতোয়া দেবার মতো সাহসী বা মহান শিল্পবোধওয়ালা রাশি রাশি সোশ্যাল মিডিয়া ঐতিহাসিক ১৮-১৯ শতকে ছিল না। এখনো দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীরা শাড়ি পরিহিতা হয়ে বঙ্গদেশে আসেন। তাই বলে ভারতের সর্বত্র তাই হবে বা ১০০ বছর পর এখানেও সেটাই তাঁদের পোশাক থাকবে এরকম কথা কোন দেবভক্তি থেকে আসে আমার বোঝবার সাধ্য নেই, কারণ সেরকম হলে মৃন্ময় মূর্তি বানিয়ে পূজা করার পদ্ধতিটাই তৈরি হত না। আর গঠনশৈলীর গড় ধারণা ছাড়া এখনো মন্দিরে নিত্য পুজো হচ্ছে বা পুকুরে প্রাপ্ত দেড়-দুহাত পাথরের মূর্তির যুগ বা বয়স নির্ণয়ের কোন্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে সে তেনারাই জানেন। যদি থাকে তাহলে পাথরের বয়স তো পৃথিবীর প্রায় সমান বের হবে, মিউজিয়ামে থাকা প্রত্ন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে গঠনশৈলী ছাড়াও কী ধরনের tool

ব্যবহার হয়েছে, মাটির কোন স্তরে পাওয়া গেছে অন্যান্য প্রাপ্ত বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সম্ভাব্য বয়সকাল অনুমান করা হয় মাত্র।

আমার মনে হয় কোনো কিছুর ইতিহাস লেখার সূচনা তার বর্তমান কালেই শুরু করা সংগত। নইলে পঞ্চাশ বছর পেরলেই সবকিছু 'ক্লাসিক' হয়ে যায়, যেমন অখাদ্য স্বপনকুমারের চটি বই যা ছুঁলে আমাদের স্কুলে জাত যেত, তা নিয়েও এখন পণ্ডিতি গবেষণার আদিখ্যেতা সহ্য করতে হয় এবং তস্যবাল ব্লকে-ছাপা মলাট নিয়ে আহা-উহহু অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়! যাক্ সে কথা দুর্গা-মূর্তির বিবর্তন নিয়ে এই লেখা নয়, অসুর কাহিনিতে ফিরে আসি।

সুহৃদকুমার ভৌমিকের *আর্য রহস্য* পুস্তিকাটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিনি এই পুস্তিকার 'অসুর সভ্যতা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—"বিশাল ভারতীয় সভ্যতা একটি মাত্র জাতি বা গোষ্ঠীর দ্বারা গড়ে ওঠেনি। খুব কম করে হলেও চারটি মৌলিক গোষ্ঠীর সমবায়ে গড়ে উঠেছে ভারত সভ্যতা। তারা হল আর্য নামে পরিচিত যাযাবর গোষ্ঠী, কোল বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড় ও ভোটচিনা। আমাদের সাংস্কৃতিক উপাদানে, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণে কোল ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব সর্বাধিক। মনে হয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা অসুরদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ভোটচিনীয় প্রভাব সর্ব্ব্যাপক হতে পারেনি। বরং যাযাবর বেদে বা বেদিয়ারা ভিন্ন-ভিন্ন দলে বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের ভাষা বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু চিন্তাভাবনা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচরণে স্থায়ী নরগোষ্ঠীরই প্রভাব ছিল বেশি।"

সিন্ধুসভ্যতা/অসুরসভ্যতা

অতুল সুর তাঁর *সিন্ধু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য* বইটির এক জায়গায় বলেছেন: "সমস্ত ঋকবেদখানা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে আর্যরা ছিল একটা হাঘরে জাত। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদের উৎপত্তি হলেও সমগ্র বেদখানাতে উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে দেবতাদের কাছে তাদের বৈষয়িক প্রার্থনা—ঋক্বেদের প্রায় ১০,০০০ মন্ত্রের মধ্যে হাজারখানেকেতে শুধু একই কথা বলা হয়েছে—দাও আমাদের শত্রুর ধন, দাও আমাদের শত্রুর সম্পদ, দাও আমাদের শত্রুর গাভী, দাও আমাদের শত্রুর মেয়েছেলে ইত্যাদি। সর্বত্রই বলা হয়েছে—"আমার শত্রুকে ধবংস করো, তাদের সকল ধন আমাদের দাও, অন্য কাউকে দিও না। কেবলমাত্র আমার মঙ্গল করো।" (পৃ ২৯) ডক্টর অতুল সুর, ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল-এর আহ্বানে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মহেঞ্জোদারো যান এবং প্রমাণ করেন যে পরবর্তীকালের হিন্দু সভ্যতার গঠনে বারো আনা ছিল সিন্ধু সভ্যতার অবদান। ডক্টর দেবব্রত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকারের মতে, "হিন্দু সভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন মার্শাল, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশ এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর।"

সেই অতুল সুর যখন বলেন, "মহাভারত অনুযায়ী বাংলা ওড়িশার জনসমূহ অসুর নৃপতি বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত সন্তান। *মঞ্জুশ্রীমুলকল্প* নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ

গ্রন্থে বাঙলার আর্যভাষাকে অসুর ভাষা বলা হয়েছে। গ্রিয়ারসন এর নাম দিয়েছিলেন Outer Arians-দের ভাষা। ঋকবেদের সর্বত্রই আমরা সিন্ধুবাসী অসুরদের উল্লেখ পাই। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল নগর নির্মাণ। অসুররা স্থাপত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল তা আমরা ময়াসুরের কাহিনী থেকে জানতে পারি। সুতরাং সিন্ধুর অসুররা যে বাঙালীদের পূর্বপুরুষ তা সহজেই অনুমেয়"— তখন গর্ব হয় বৈকি! (পৃ ২৬) তবুও একটি তথ্য, অতুল সুরের *বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* ১৯৪২-এ গান্ধীর 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের বিপ্রতীপে 'হিন্দু মহাসভা'-র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রকাশনা, হয়তো বাঙালিকে বিযুক্ত করে তৎকালীন 'জাতীয়তাবাদ'কে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে! 'হিন্দু মহাসভা' ও 'মুসলিম লীগ' উভয়েই ভারতছাড়ো আন্দোলনের বিরোধী ছিল।

সুহৃদকুমার ভৌমিকের কথায় ফিরে আসি, তাঁর মতে— **কোল** জাতি ছিল প্রভাবশালী জাতিদের মধ্যে প্রধান ও প্রাচীনতম। তখন এই বিশাল কোল জাতি কতগুলি শাখায় বিভক্ত ছিল তা বলা শক্ত, তবে এখনকার ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরে কোল ভাষাগোষ্ঠীকে নিম্নলিখিত শাখায় বিভক্ত করা যায়, অসুর, কড়ওয়া, করকু, করমালি, কোড়া, খেড়িয়া, গদব, তুরি, মাহালি, বীর হোড়, ভূমিজ, নাহালি, মুণ্ডা, যুয়াং, শবর, সাঁওতাল, হো। একটা জিনিস লক্ষ করার যে, এ সমস্ত উপজাতির বর্তমান আবাসস্থল বাঙলা, বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ, এক কথায় ছোটোনাগপুর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ভাষা ও স্থান-নামের বিচারে ভারতীয় সভ্যতার উপাদান ও

বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যায়, এক সময়ে সারা ভারতে কোল বা অসুর সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। অতি প্রাচীন যুগে ওই সমস্ত কোল গোষ্ঠীর মানুষ পরবর্তী কালে আগত দ্রাবিড়, যাযাবর বেদিয়া গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে একত্র হয়ে যায়। ফলে বর্তমান কোল গোষ্ঠীর মানুষদের দেখে বিশাল কোল সভ্যতার মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। আসলে কোল সম্প্রদায়ের মানুষরা অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে একাকার হয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তৈরি করেছে। বর্তমান ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত কোল সম্প্রদায়ের সাঁওতালরা হল তাদের দলের প্রধান শাখা। আর **অসুর**রা সংখ্যায় লঘু হলেও তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি, এক কথায় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছে। বর্তমান অসুররা কৃষিকর্মকে জীবিকা হিসাবে নিলেও তাদের মৌলিক জীবিকা ছিল লৌহ আকর থেকে আগুন জ্বালিয়ে লোহা তৈরি করা। তৎকালীন কোল সমাজ এই অসুর সম্প্রদায়ের উপরই লৌহনির্মিত অস্ত্র তৈরির জন্য নির্ভর করত। লৌহ এবং অস্ত্রের নিয়ামক হিসাবে কোল সমাজে অসুর গোষ্ঠীই প্রাধান্য পেয়েছিল অথবা কোল (Austro-Asiatic) গোষ্ঠীর প্রধানরাই অসুর নামে খ্যাত হয়েছিল। ফলে অসুর শব্দের মৌলিক অর্থ হয়ে দাঁড়ায় দলপতি বা নেতা। সম্ভবত প্রাচীন যুগে কোল ভাষাগোষ্ঠীতে অসুর বা আসুর শব্দের অর্থ ছিল নেতা। কারণ সাঁওতালিতে আয়ুর শব্দের অর্থ নেতৃত্ব। 'আয়ুরীঃচ' অর্থাৎ নেতা। শব্দটি অসুর থেকে অহুর ও পরে আয়ুর হয়েছে, সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে, কোল গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষই, বিশেষ করে নেতারা সর্বদাই অসুর নামে পরিচিত ছিল।

"এই অসুর সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাঙলায় সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল এবং এই সভ্যতা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। উৎখননের ফলে যে-সমস্ত লোহা-গলানো চুল্লি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে বর্তমান অসুর উপজাতির ব্যবহৃত চুল্লির কোন পার্থক্য নেই। লোহা গলানোর আদিম পদ্ধতিটিকে এখনও পর্যন্ত অসুর সম্প্রদায় কেন ফেলে দেয়নি, তার উত্তরে টাটার এক বিজ্ঞানী বলেছিলেন, এই আদিম পদ্ধতি খুবই বিজ্ঞানসম্মত। জ্বালানি ও লৌহ আকরকে একসঙ্গে রেখে উত্তাপ সৃষ্টি করলে তাপের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে দ্রুত লোহা গলানো সম্ভব। সে যুগে অতি উচ্চমানের তাপসৃষ্টির পদ্ধতি জানা না থাকায় মানুষ বাধ্য হয়ে তা-ই করত। ফলে একটি চুল্লি কিছু দিন ব্যবহার করার পর ধাতুর আবর্জনায় অকেজো হয়ে যেত। কারণ কাঠকয়লার ছাইপাশের সঙ্গে লোহার পরিত্যক্ত অংশ থেকে যেত। তখন তার পাশে আবার নতুন চুল্লি তৈরি হত। বেলপাহাড়ি, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে ঐ লোহা-গলানো চুল্লির ধ্বংসাবশেষের সংবাদ পাওয়া গেলেও মেদিনীপুর ও সিংভূমের সীমান্ত অঞ্চলে বহড়াগড়া থানায় খাণ্ডামৌদা গ্রামে একেবারে পাশাপাশি লাগোয়া অসংখ্য চুল্লি আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়, এক সময়ে বহু সংখ্যক অসুর লোহা গলানো ও অস্ত্রনির্মাণের কাজে সেখানে নিযুক্ত ছিল। গ্রামটির নাম খাণ্ডামৌদা অর্থাৎ অস্ত্রের স্থান বা অস্ত্রাগার।"

সুহৃদকুমার ভৌমিকের ধারণা ওই একটি গ্রামেই, "কয়েক সহস্র চুল্লি মাটির তলায় লুকিয়ে আছে। ঐ চুল্লিগুলি আবিষ্কৃত না-হলে খাণ্ডামৌদা নামের তাৎপর্য বোঝা যেত না। চুল্লিগুলি মাটির যে-স্তরে অবস্থান করছে, তা তার প্রাচীনত্বকে প্রমাণ

করে।" ওই অঞ্চলে নিবিড়ভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগে তিনি স্থানীয় লোকেদের কাছে জানতে পারেন একটি উপকথা— "এই গ্রাম ছিল কামারদের দ্বারা পরিপূর্ণ। দিনরাত টুংটুং শব্দে অঞ্চলটা জীবন্ত ছিল। তারপর এক দেবীর কু-দৃষ্টিতে কামাররা সব গেল মরে। এখনও কামারদের উপর দেবীর কু-দৃষ্টি সরে যায়নি। কামার জাতের কোন লোকের খাণ্ডামৌদা গ্রামে রাত কাটানোর অধিকার নেই। কেউ থাকতে চাইলেও গ্রামবাসীরা তাকে থাকতে দেয় না। তাতে গ্রামবাসী ও কামার, উভয়েরই বিপদ। এই কাহিনী শোনার পর স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা হয় যে, লৌহ তৈরিতে যারা ব্যস্ত থাকত, কোন কারণে তারা এই গ্রাম ত্যাগ করেছিল। স্থানীয় অঞ্চলে লৌহ আকরিকের অভাবে, বা ডাইনির কু-দৃষ্টির ভয়ে, বা হঠাৎ বিদেশি শত্রুর আক্রমণে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়। তারপর সেই অব্যবহৃত চুল্লিগুলির উপর গড়ে উঠেছে গোটা একটা গ্রাম। গ্রামের নাম কিন্তু থেকে গেছে সেই খাণ্ডামৌদা (অস্ত্রস্থান)। লোকে কামার জাতির কথা বললেও আসলে তারা কামার নয়, অসুর, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তখনই জানতে চেয়েছিলাম, অসুর শব্দের সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় আছে কি না। স্থানীয় লোকেরা বলেছিল, সেখান থেকে প্রায় ৬-৭ মাইল দক্ষিণে সুবর্ণরেখার তীরে অসুরগড় বা অসুর হুড়া বলে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়ে রয়েছে। গিয়ে দেখি, সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার। স্থানটা বাঙলা ও বিহারকে নিয়ে সুবর্ণরেখার তীরে। তার যেখানে-সেখানে বিরাট-বিরাট উঁচু ঢিবি, ছড়িয়ে আছে পুরনো আমলের অনেক ইট। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, প্রাচীন যুগে কোন অসুর রাজার আবাসস্থল ছিল তা।"

মহিষাসুর সম্পর্কে এই প্রবন্ধেই সুহৃদবাবু তাঁর মতামতে বলেছেন, "খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্বেই এ দেশে বিরাট এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যাতে যাযাবর আর্যদের কোন উপাদান ছিল না। দ্রাবিড় গোষ্ঠী ও তার পূর্ব্ববর্তী কোল গোষ্ঠীর মিলিত রূপে গড়ে উঠেছিল এই প্রাচীন সভ্যতা। যাযাবররা তাদের আগ্রাসী মনোভাবে সেই সভ্যতাকে আত্মসাৎ করে এবং এই তিন মৌলিক জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গড়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তৈরি করে এক সু-পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা। সিন্ধু নদের তীরেই বিদেশিরা এই সভ্যতার সাক্ষাৎ পেয়েছিল বলে পরবর্তী কালে তা সিন্ধু সভ্যতা বা হিন্দু সভ্যতা নামে পরিচিত হয়। এই সমাজব্যবস্থা বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে এই মিশ্রিত সভ্যতার মানুষ বিশুদ্ধ **দ্রাবিড়দের রাক্ষস** ও **অস্ট্রিকদের অসুর** বলত। যদিও এই দুটি শব্দ মহৎ ও শ্রেষ্ঠ অর্থে প্রথমত ব্যবহৃত হয়েছিল, পরবর্তী কালে তা হীনার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারত দ্রাবিড় ও পূর্ব ভারত অস্ট্রিক জাতি অধ্যুষিত ছিল বা এখনও আছে। সেই সূত্রে জরাসন্ধ, কংস, কংসের ভাগ্নে শ্রীকৃষ্ণ সকলেই অস্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠীর বা অসুর গোষ্ঠীর। শ্রীকৃষ্ণ সকল সংস্কৃতি মিলিয়ে অখণ্ড ভারত সভ্যতা গড়তে চেয়েছিলেন। আর কংসাসুর প্রভৃতি আপন বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদে বিশ্বাসী ছিল। যা-ই হোক, মহিষাসুরও সেই অর্থে ভারতীয়। [...] **মহিষাসুর** তথা শ্রেষ্ঠ অসুর বা নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বিরোধী কোন রাজা, বাঙলাকে কেন্দ্র করে তিনি পূর্বভারত স্বতন্ত্র রেখেছিলেন। তার এতই প্রতাপ ছিল যে মিশ্রিত আর্য সভ্যতা পূর্বভারতে সহজে এগোতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রচারক

ও প্রধানরা এই প্রবল শক্তিসম্পন্ন শাসনকর্তাকে পরাজিত করতে দীর্ঘ সময় নিয়েছিল এবং যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল দুর্গার নামে। **দুর্গা মূলত বিদেশি দেবী। দুর্গাবিরোধী অসুর রক্তের মানুষ যাতে দুর্গাকে সহজে স্বীকার করে নেয়, সেই জন্যই পুরোহিত সমাজ দুর্গা, কালী ও চণ্ডীকে একই শক্তি বলে কল্পনা করেছেন।** বাঙালির সম্পূর্ণ অপরিচিত জন্তু সিংহের পিঠে চেপে আসা 'সিংহবাহনা' দুর্গা সম্ভবত ব্যাবিলনের বিখ্যাত রণজয়ী (war-goddess) **ননা**।"

আমরা জানি, সিন্ধুসভ্যতার বসবাসকারী মানুষদের মেলুহা বা মিল-এচ বা ম্লেচ্ছ বলা হত। কিরীটি মাহাত তাঁর *সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি* নামক পুস্তিকায় বলেছেন, "চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবগাজনে শিবকে মেলুহা নামেই অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মহিষাসুরের অপর নাম মেলুহা।"

পুরাণে যাই থাকুক-না কেন আমরা আমাদের মস্তিষ্কে দেবাসুরের দ্বন্দ্বটাকে একটা অদ্ভুত ধর্মীয় মৌলবাদী রূপ দিয়ে দিয়েছি সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। রামায়ণ থেকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যায়, কারণ এর শিশুপাঠ্য গল্পটুকু অন্তত সব্বাই জানেন, লক্ষ্মণ হলেন আদর্শ ভাই, সে সর্বদা দাদার পাশে, প্রয়োজনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দাদা বউদিকে পরিচর্যা করার জন্য স্বেচ্ছায় বনবাসে ব্রহ্মচারী, তার বউদিকে ধরে নিয়ে গেছে দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ, তাই সে রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করে নিরস্ত্র অবস্থায় খুন করে, দাদার শত্রু নিধনে এহেন অপকর্মে তার কোনো পাপ হয় না, তিনি উন্নতচরিত্র অনুকরণীয় ভ্রাতার আদর্শ পালন করেন, আজও

এই ভারতবর্ষে রাম-লক্ষ্মণ আদর্শ ভ্রাতা। অথচ রাবণের ভাই বিভীষণ, রাক্ষস কুলে একমাত্র বিশ্বাসঘাতক, শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে পরবর্তীতে রাজা হন, তিনিও নাকি পরম ধার্মিক! এই দুটো একসঙ্গে যে যুক্তিতে একই মস্তিষ্কে সঠিক হতে পারে তা একটি মৌলবাদী মস্তিষ্ক।

এছাড়াও পৌরাণিক বেশকিছু বিষয়ে আমাদের অশিক্ষা প্রসূত ভ্রান্ত আধুনিক ধারণা আছে। অথবা জানলেও বিচার করার সময় সেগুলো আমরা খেয়াল রাখি না। সাধারণভাবে এগুলি আব্রাহামিক ধর্মের পরোক্ষ প্রভাব। কিন্তু বিষয়গুলোকে যথাযথ ভাবে বুঝতে গেলে এই সমস্ত ভুল ধারণাগুলোকে কাটিয়ে ওঠা দরকার। আমি মাত্র দুটি উদাহরণ দিচ্ছি—

পাতাল সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা সেটা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। কিন্তু পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে লিখিত আছে পাতাল সাতটি, প্রথমে অতল, তারপর পর্যায়ক্রমে বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। এই সপ্তপাতাল **স্বর্গের অধিক সুখকর স্থান**। এইজন্য ইহাকে মুনিগণ বিলস্বর্গ বলিয়া অভিহিত করেন। ইহারা শতযোজন বিস্তৃত। এই পাতাল সমৃদ্ধভবন, উদ্যান, বিহার, আক্রীড়, চত্বর প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত, ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণে আছে এই সকল পাতাল স্বর্গলোক হইতে রমণীয়, এইখানে দিবাভাগে সূর্যকিরণ আতপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্র শীতকিরণ প্রদান করেন না, কেবলমাত্র আলোক দান করিয়া থাকেন। দেবীভাগবতে আছে পাতাল সমূহের জলরাশি নানাজাতীয় বিহঙ্গবর্গে বিমণ্ডিত, হ্রদ সকল স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ। দিবা বা রাত্রি কোনো কালেই তথায় কোনো

প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। বলীপলিত, জ্বর, জীর্ণতা, বিবর্ণতা, প্রভৃতি বয়োঃবস্থা এখানকার অধিবাসীদিগকে কোনোরূপ ক্লেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ষষ্ঠ পাতাল **রসাতল** বিখ্যাত স্থান, এখানে দৈত্য-দানব ও পাণি নামক অসুরগণ বাস করেন, ইহা ভিন্ন এখানে হিরণ্যপুর নিবাসী নিবাতকবচগণ এবং দেবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী কালকেয় নামক অসুর সকল বাস করে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ, একাদশ ভাগে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে। প্রাচীনকালে আমেরিকাকে পাতাল বলা হত একথাও শোনা যায়!

সত্ত্ব ও **তম** গুণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা তৈরি করা হয়েছে সত্ত্ব ও তম যেন ভালো-মন্দের মতো দুটি বিপরীতমুখী গুণ, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল। অথচ সকলেই জানেন জগৎ ত্রিগুণাত্বক, সত্ত্ব রজ তম। গুণ সাম্য হলে লয় হয়, গুণ বৈষম্যে সৃষ্টি। বায়ুপুরাণে বলা হয়, গুণক্ষোভ থেকেই তিনদেবতার সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা সর্বজীবকে আশ্রয় করে রয়েছেন। রজ **ব্রহ্মা**, তম **অগ্নি**, সত্ত্ব **বিষ্ণু**। রজ প্রকাশ করে থাকেন যে ব্রহ্মা, তিনি স্রষ্টা রূপে, তম প্রকাশ করেন যে অগ্নি তিনি কালরূপে আর সত্ত্ব প্রকাশ করেন যে বিষ্ণু তিনি উদাসীন রূপে। এঁরা তিনলোক, এঁরাই তিনবেদ আর এঁরাই তিন অগ্নি। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকেন, এঁরা একে অপরের অনুরক্ত একে অপরের সাহায্যে থেকে পরস্পরকে ধারণ করে থাকেন। এঁরা ক্ষণের জন্যও পরস্পরকে ছেড়ে থাকেন না। **অগ্নি, রুদ্র এবং শিব তম**। দেবী চণ্ডীতে সত্ত্বগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী **বাগদেবী**, রজোগুণে বিষ্ণুর পত্নী **লক্ষ্মী** এবং **তমোগুণে শিব বনিতা পার্বতী**। বিষ্ণু সত্ত্ব বলে

বিষ্ণুপন্থীদের অপব্যখ্যায় সত্ত্বকে ‘উৎকৃষ্ট’ প্রমাণ করার প্রচেষ্টা আছে, আমরা গীতব্যাখ্যায় তার শিকার। ‘দর্শন’ বা ফিলজফিকে রিলিজিয়ন রূপে দাঁড় করাতে গেলে যে মৌলবাদী অর্থসংকোচন ঘটে এটি তার প্রমাণ।

বিদেশি পুরাণকথায় মহিষাসুর এবং আর্যতত্ত্ব

পুরাণকাহিনি নিয়ে কথা হচ্ছে যখন, তখন বিদেশি পুরাণে প্রাচীন সভ্যতায় মহিষাসুরকে পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার। চন্দ্রগুপ্তের ঐতিহাসিক-পুরাতাত্বিক কালনির্ণয় যেমন মেগাস্থিনিস-এর বিবরণের ‘সান্দ্রাকোট্টাস’ বা ‘অগ্রামেনেস’ দ্বারা হয়ে থাকে, তেমনি তুলনামূলক আলোচনায় যেতে গেলে এবিষয়ে বিস্তারিত পৃথক প্রবন্ধ প্রয়োজন, আপাতত এগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা ভিন্ন উপায় নেই।

গ্রিকরা গ্রিস দেশে বাইরে থেকে এসেছিল, তারা গ্রিসে এসে যে সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছে, সেটি **মাইসিনিয়ান** সভ্যতা। মাইসিনিয়দের প্রস্তর নির্মিত বড়ো-বড়ো নগর ছিল এবং তারা নাকি দৈত্য বা সাইক্লোপসদের দ্বারা নির্মাণকার্য করত। যাদের ভাষার সঙ্গে মিশেলেই গ্রিক ভাষার পূর্বরূপ ‘মাইসিনিয়ান-গ্রিক’ তৈরি হয়েছিল। এই মাইসিনির সঙ্গে তার আগের **মিনোয়ান** সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত গ্রিকপুরাণের **মিনোটার** যার অর্ধেক ষাঁড়, বাকি অর্ধেক শরীর মানুষের। তাকে রাজা মাইনোস গোলকধাঁধার মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলেন। গ্রিক বীর থেসেউস তাকে বধ করেন। গ্রিকরা তাকে মানুষখেকো দানব হিসাবে দেখেছে। কিন্তু তার আগের এট্রস্ক্যান সভ্যতা তাকে দেখেছে অন্যভাবে, ষাঁড়ের

থেসেউস ও মিনোটার

শিশু মিনোটার

মাথাওয়ালা শিশু মিনোটার তার মা, মাইনোসের স্ত্রী **প্যাসিফি**র কোলে বসে আছে, পানপাত্রের গায়ে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। ঠিক আমাদের পার্বতীর কোলে গণেশের মতো। ক্রিটের ক্লোসসোসে পাওয়া একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পর্বতশিখরে দণ্ডায়মান দুই পাশে দুটি সিংহ-সহ **রেহা** দেবীর মূর্তি দেখা যায়, যিনিই হয়তো এশিয়া মাইনরের দেবী **সিবিলি**। আমাদের দুর্গাও তো **পার্বতী** এবং **সিংহবাহিনী**! ব্যবিলনীয় ভাষায় 'মাতা' শব্দের রূপ '**উম্মু**' বা '**উম্ম**', অক্কাদীয় ভাষায় '**উম্ম**', দ্রাবিড় প্রতিশব্দ '**উন্মু**'—সবগুলোই '**উমা**' শব্দের রকমফের।

মাইসিনির সঙ্গে মাইসোর বা মহিষ্মতীর অথবা রাজা মাইনোস-এর সঙ্গে মহিষাসুর-এর সম্পর্ক জুড়ে দিলে ফচকেমির মতো শোনাবে, কিন্তু বস্তুত বিষয়টি অত হালকা নয়। (অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেন English Literature and Language আর পড়তে হল সফোক্লিস, অ্যারিস্টোফেনিস অথবা ছোট্ট থেকে জেনে এলেন চাণক্য হলেন প্রাচ্যের ম্যাকিয়াভেলি,

পরে দেখলেন ম্যাকিয়াভেলি ইতালিয়ান ভাষায় *দ্য প্রিন্স* লিখেছেন ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে আর চাণক্য আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে!!! এগুলোর থেকে বেশি ফাজলামো অবশ্যই নয়।) এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তাও হয়েছে, ডক্টর ত্রিপুরা বসু তাঁর *বাংলা পাণ্ডুলিপির পাঠ পরিক্রমা*-র ভূমিকায় লেখেন—"ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, তমলুক, হরিনারায়ণপুর ইত্যাদি স্থানের প্রত্ননিদর্শনের সাদৃশ্য তো এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকদের এই সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত করেছে যে, রাজা মাইনোস ও তাঁর সংস্কৃতি (যেমন মহিষাসুর ও সিংহবাহিনী এক মাতৃদেবী) বাংলাদেশ থেকেই গেছে হয়তো।"

আর্য আক্রমণ তত্ত্বের পালটা হিসেবে আজকাল 'আউট অভ ইন্ডিয়া' তত্ত্ব শোনা যায়, যার মূল্য ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে যথেষ্টই কম, কারণ প্রত্যেকটি তত্ত্বের সৃষ্টি আর তাকে রক্ষার আড়ালে থাকে ক্ষমতার রাজনীতি, জ্ঞানচর্চার রাজনীতির সঙ্গে সেটা মিশলে হয়ে ওঠে আরও জটিল, অধিকাংশ সময়েই তা চলে যায় বোধগম্যতার পরিসরের বাইরে। আমার বক্তব্য হল, উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে একটি ভাষার শ্রেণিবিভাগ থেকে, একটি জলজ্যান্ত জাতি বা Race আমদানি করাটা যেহেতু খুব সহজেই ক্ষমতার রাজনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাই তার পালটাস্রোত হিসেবে, 'ভারত থেকেই সব জাতি সারা পৃথিবীতে ওই ভাষা নিয়ে গেছে'—একইরকম সব যুক্তি ব্যবহার করে এই তত্ত্ব প্রচার হওয়ারই ছিল। বা বলা ভালো প্রায় সমসময় থেকেই প্রচলিত ছিল। অনেকেই বলেছেন সেরকম কথা। তবে পাক্কা 'আউট অভ ইন্ডিয়া' তত্ত্ব পাওয়া

যাবে স্বামী বিবেকানন্দের সামান্য কয়েকটি বাক্যে, তাঁর আশ্চর্য ভাষা দক্ষতার নিদর্শনে—"মান্দ্রাজ সেই 'তামিল' জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের 'সুমের' নামক শাখা 'ইউফ্রেটিস' তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতা-বিস্তার অতি প্রাচীনকালে করেছিল, যাদের জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর এক শাখা মালাবার উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাদের কাছে আর্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা বীরবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করেছে। এই যে এত বড়ো বৈষ্ণবধর্ম-ও এই 'তামিল' নীচবংশোদ্ভূত শঠকোপ হতে উৎপন্ন, যিনি 'বিক্রীয় সূর্পং স চচার যোগী'। এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন।" (*স্বামীজির বাণী ও রচনা*, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন, পৃ ৮৫)

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বাঙ্গালার ইতিহাস* প্রথম পর্বে বলেছেন, "আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাঁহারাই বোধহয় ঋকবেদের দস্যু এবং তাঁহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড়জাতিই বঙ্গ ও মগধের আদিম অধিবাসী।"

অথবা, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "আর্যদের ধর্ম পারস্যের মধ্য দিয়া এশিয়া মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্যধর্ম বরাবর এশিয়া মাইনরে গিয়াছে।" (*ভারত সংস্কৃতির উৎস ধারা*, পৃ ১৯)

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেন—"ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বৈদিক আর্যরা বহির্ভারতীয় ব'লে যে রায় দিয়েছিলেন, সেই রায়কে আজও আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে চলেছি। ভারতীয় অধিকাংশ পণ্ডিতই গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে চলেছেন [...] ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছিল, এ সত্য স্বীকার না করার পক্ষেও তো কোনো জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না"। (পৃ ৬৬-৬৭)

এসব কথা যদি বর্তমানের 'ইতিহাসের গৈরিকীকরণ'-এর সমার্থক বলে মনে হয়, তাহলে ভুল বোঝা হবে। কারণ এঁরা সকলেই স্বঘোষিত হিন্দু, কিন্তু বঙ্গে বহিরাগত ব্রাহ্মণ্য জাতপাতের সমর্থক ছিলেন না, ছিলেন বিরোধী। এবং সমস্ত জনসংখ্যার বিচারে কর গুনে হিসেব করা যায় এমন বামুনদের প্রসঙ্গে নয়, সমগ্র জনজাতির কথাই তাঁরা বলেছেন। অধুনা গৈরিকীকরণ বা হিন্দুত্ববাদ মূলগতভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ আর সেযুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী যাঁরা ছিলেন সেই বাঙালিরাই 'আর্য-আক্রমণতত্ত্ব'-কে চ্যাম্পিয়ান করার আসল খেলোয়াড়। তাই এখন পূর্বের রাজনীতির সমর্থকরা বর্তমান রাজনীতির বিরোধিতা করলে ঐতিহাসিক সত্য-মিথ্যা কিছুই প্রমাণিত হয় না, হয় 'রাজনীতি করা', ক্ষমতার জয়গান গাওয়া। তাই তথাকথিত বামপন্থী ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা সর্বদা খড়গহস্ত। কারণ উভয়েই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পুরাণ-ভাষ্যকার, ইন্দো-ইউরোপিয়ানকে বা প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপিয়ানকে জাতির রূপ দিতে চান—এক দলের কাছে সে জাতি ইন্ডিজেনাস বা ইন্দ(হিন্দ)জ, আরেক দলের কাছে

‘বহিরাগত’। যাইহোক হিন্দুত্ববাদীরা অধিক মারাত্মক কারণ তাদের কাছে ‘আর্য’-ও জাতি আবার ‘মুসলমান’-ও জাতি। দুই দল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, ঐতিহাসিক খেলা শুরুর আগে ব্যবহৃত ‘টস’-এর মুদ্রা যেন, পেশাদার খেলোয়াড়রা তৈরি, প্রতিযোগিতা অবশ্যই আছে, সেটি হল পেশাদারিত্ব প্রদর্শন। আমরা দর্শককুল পক্ষ নিয়ে উত্তেজনার আঁচ পোয়াতে পোয়াতে কখন যে পারস্পরিক দাঙ্গা মারামারিতে জড়িয়ে পড়ি, বোধবিহীন পক্ষাবলম্বন করি, বুঝতেও পারি না।

আদপে আর্য আক্রমণ তত্ত্বটা এতই ছেঁদো যুক্তির উপর তৈরি ছিল যে, নেহাত গপ্পো শুনে পণ্ডিতি-মারা যাঁদের স্বভাব, তাঁরা ছাড়া আর কেউই যৌক্তিকভাবে মানতে পারেননি। তবে ওই তালি-তাপ্পা দিয়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে টিকে থাকতে আর একদল ব্যক্তিগত বা জাতপাত-গত কারণে দালালি করে গেছেন এখনো করেন, এমনকি জিন গবেষণাও এই রাজনীতি মুক্ত হতে পারেনি। (সদ্য ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ‘Science’ পত্রিকায় ‘The formation of human populations in South and Central Asia’ [DOI: 10.1126/science.aat7487] যেখানে মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে বিগত আট হাজার বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ৫২৩-টি প্রাচীন দেহাবশেষের DNA পরীক্ষায় মানব উদ্বর্তনের এক নতুন মধ্যম-পর্যায়ের প্রস্তাবনা এবং ‘Cell’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন রাখিগড়িতে প্রাপ্ত ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বের কঙ্কালের DNA রিপোর্ট, যার শিরোনাম, An Ancient Harappan Genome Lacks Ancestry from Steppe Pastoralists or Iranian Farmers, Highlights:

• The individual was from a population that is the largest source of ancestry for South Asians • Iranian-related ancestry in South Asia split from Iranian plateau lineages >12000 years ago • First farmers of the Fertile Crescent contributed little to no ancestry to later South Asians [doi.org/10.1016.j/cell/2019/08/048] দেখা যাক এবার কী কী চব্ব তৈরি হয়।) আর্যতত্ব ও তৎসংলগ্ন জাতপাতের মতো জটিল ও বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা করবার পরিসর এখানে নেই, মহিষাসুর সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের পরিকল্পনা আছে অনেকদিনের, যদি কখনো রূপায়িত হয় অর্থাৎ আদৌ লিখে ওঠা যায় তখন দেখানো যাবে আপাতত অতি সামান্য উল্লেখ এবং উদ্ধৃতিতে কাজ চালাতে হবে। যেমন এ প্রসঙ্গে যিনি সবচেয়ে গোলমেলে 'যখন-যেমন-তখন-তেমন' (একই বই বা প্রবন্ধে কখনও 'আর্য'—'ভাষা' আবার কখনও 'জাতি'বাচক) অবস্থান অনুসারী, সেই বাংলাভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর ভাষায়, "যাহা হউক, আগেকার জ্ঞান-গোচর এবং কল্পনা-মতে, মধ্য-এশিয়া হইতে আর্যেরা ভারতে আসিল তাহারা সুসভ্য শ্বেতকায় জাতি, উচ্চ সভ্যতা ও মনোভাব লইয়া, ভাবতের আদিম অধিবাসী অসভ্য কৃষ্ণকায় অনার্যদিগকে জয় করিয়া এদেশে রাজা হইয়া বসিল। আর্যেরা অনার্যদের অনায়াসেই নিজেদের অধীন করিয়া লইল অনার্যের বিজিত হইয়া আর্য প্রভুদের দাসত্ব স্বীকার করিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণের লোকেরা আর্য-বংশজ, আর বিজিত অনার্য হইল শূদ্র। হিন্দু সভ্যতা মুখ্যতঃ বৈদিক আর্যদেরই সৃষ্টি, হিন্দু জাতির মধ্যে

যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সাধু, সৎ ও শাশ্বত তাহার প্রায় সমস্তই আর্যজাতির দান, এবং যাহা-কিছু নিকৃষ্ট, কুৎসিত, অসাধু, অসৎ ও ক্ষণস্থায়ী, তাহার সবটাই অনার্য্য-মনোভাব-জাত। [...] ভারতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ সহজেই এইরূপ মতবাদ মানিয়া লয়, ইহাতে প্রবল ইউরোপীয়গণের সহিত দূর-গত স্বাজাত্যবোধ-জনিত একটু প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ হয় তো বিদ্যমান ছিল, সে আত্মপ্রসাদটুকু স্পষ্টতঃ স্বীকার করাও হয় তো লজ্জার বিষয় ছিল। [...] কিন্তু উপরে বর্ণিত এই মতবাদ এখন ধীরে ধীরে পবিবর্তন কবিবার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছে।" এবং আরও একটু পরিষ্কার ভাবে, মোটামুটি ১৯৪৩-এ লেখা— "ভারতবর্ষে বহু শত বৎসর পূর্বে যে-সব আর্য মানুষ এসেছিল, তারা ইউরোপীয়দের পূর্ব-পুরুষদেরই জ্ঞাতি, সুতরাং ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু, যারা নিজেদের বিশুদ্ধ আর্যবংশীয় বলে মনে করে একটু গর্ব করে থাকে, তারা হ'ল ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়দেরই স্বগোত্রীয় দূর সম্পর্কে জ্ঞাতি। কথাটা ভারতীয় উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছে মন্দ লাগল না (আর এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই তো প্রথমটা ইংরেজি পড়তে আরম্ভ করেছিল) রাজার জাতি ইংরেজ, তাঁদের সঙ্গে এক গোষ্ঠীর, একথা উচ্চবর্ণের হিন্দুর মনের নিভৃত কোণের মধ্যে একটু পুলকের ঝিলিক এনে দিয়েছিল বলেই মনে হয়"। (*ভারত সংস্কৃতি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ ১৬ এবং ৩)। উদ্ধৃত অংশে কিঞ্চিৎ বাঁকা ইঙ্গিত থাকলেও যা বলা হয়নি সেটি হল, প্রাথমিকভাবে ওই উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যে নব্বই শতাংশ ছিল স্রেফ বাঙালি, যাদের তথাকথিত উচ্চবর্ণত্ব-র দাবিতে উত্তর-পশ্চিমের ঘোড়াও

হাসে, আর দক্ষিণের তামিল ব্রাহ্মণেরা উত্তরের বামুনদের দীক্ষা পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করতেন বেজাত বলে, তা আগে উদ্ধৃত বিবেকানন্দ বচনের ঠিক পূর্বে খুঁজলে পাঠক পেয়ে যাবেন। বাংলার ভাষাচার্য বারংবার 'আর্য' জাতি বলে গেছেন, এবং আদি দ্রাবিড়দের প্রসঙ্গে দিব্য তাদেরও ওই আর্য রাস্তা দিয়েই ভারতে প্রবেশের গল্প বলেছেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এটাই যাঁরা 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব' মানেননি প্রথম থেকে, তাঁরাও প্রায় সকলেই 'আর্য জাতি'-র গল্পটা মেনে নিয়েছিলেন। নাটের গুরুঠাকুর ম্যাক্সমুলার শেষ দিকে বারবার বলেছেন—"আর্য একটি ভাষার নাম, তাকে জাতি পরিচয় দেওয়া চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক।" আর্যরা বহিরাগত না ভূমিপুত্র প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তথাকথিত আর্য জাতির অস্তিত্বই ছিল না—এ প্রসঙ্গে একটানা বিস্তারিত ইংরেজি ও বাংলায় লিখে গেছেন পরমেশ চৌধুরী। ম্যাক্সমুলারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন— "কিন্তু তীর একবার ছুঁড়ে দিলে কি তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায়? বিশ্বময় আর্য জাতির জয়ধবজা উড়িয়ে স্লোগান তুলে সে স্লোগান কি আর থামানো যায়? মানুষ যাতে একবার বিশ্বাস করতে শুরু করে সে বিশ্বাস থেকে তাকে ফেরানো কি অতই সোজা? এনসাইক্লোপিডিয়া এবং পাঠ্যপুস্তকে তাঁর আগের বক্তব্য স্থান পেয়েছে, সেগুলো পাল্টাবে কে? অতএব তাঁর ভুল শোধরানোর চেষ্টা বৃথা গেল। বলাবাহুল্য আমরা এখনো তাঁর ভুল শোধরানোর প্রচেষ্টার সাথী হতে পারিনি। মিথ্যাটাই শিখে এসেছি, শিখিয়ে যাচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'বাঙালি জাতির উৎপত্তি' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁর ভাষাতত্ত্বের উপর

ভিত্তি করে। এ ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই তিনি বাঙালিকে আর্য-অনার্য দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ ভাষাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর শিষ্যরা ভারতবাসীদের আর্য-অনার্য ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই বিকৃত করে লেখা হয়েছে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, বাংলা ভাষার ইতিহাস, সঙ্গীতশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র সব।" (*আর্য জাতির অস্তিত্বই ছিল না*, ১ম খণ্ড, ১৪১৮, পৃ ১৪৫-৪৬)

সত্যিই আশ্চর্য! মোটামুটি ১৮৫০-এর আগে ইয়োরোপে বা ভারতবর্ষে আর্য জাতির কথা কেউ জানতই না, অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে শতকরা নিরানব্বই জন শিক্ষিত ইউরোপীয় এবং ভারতীয় আর্য জাতির অস্তিত্বে নিঃসংশয় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আজও যার বদল ঘটেনি, ঘটবে এরকম সম্ভাবনাও অদূর ভবিষ্যতে নেই। অসুর উৎসবের প্রবক্তা অজিতপ্রসাদ হেমব্রম তাঁর কথাতেও সেই আর্য জাতি বা সভ্যতাকে বহিরাগত শত্রু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বসেন।

গোদের উপর বিষফোঁড়া 'হিন্দুত্ববাদ' ও তাদের অধুনা নির্মিত 'আউট অভ ইন্ডিয়া' মতবাদ। তাদের কাছে আর্যও জাতি আবার মুসলমানও জাতি! বেদোমির চূড়ান্ত যাকে বলে! 'আর্য' জাতি এবং তারা সকলে ভারত বহির্গত হলে, ঐতিহাসিককালে ভারতে আগমনকারী মুসলমান বা ইসলামে বিশ্বাসীরাও আর্য এবং তাদের পূর্বপুরুষরা ভারতবাসী, আর যারা এদেশে ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাদের নিয়ে তো কথাই ওঠার কথা নয়! 'হিন্দ' যদি দেশ হয়, তাহলে হিন্দু-রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ আসে কী

করে! মানে যুক্তিটা এরকম, 'ভারত' আমাদের দেশ, সেটাকে 'ভারতবর্ষ' বানাতে চাই। 'ভারতে আগত' এবং 'ভারত থেকে বহির্গত' এই উভয় তরফের মোদ্দা কথার সচলার্থ যা দাঁড়ায় তা হল—দু-চারটে লোক কাল্পনিক নিজ বংশ ও রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের বাসনায়, নিজদেশের অধিকাংশের অপমান করে চলে 'অনার্য', 'শূদ্র' ইত্যাদি নামে, অথচ যাবতীয় গর্ব দেশ নিয়ে! এবং এটা এই গণতান্ত্রিক দেশে চলতে পারে!! সত্যিই বিষ্ণু অবতার ভগবান বুদ্ধ সকলকে অহিংস পাষণ্ডে পরিণত করেছেন, নচেৎ এদের পরজন্মে অবধারিত গুয়ে-মাছি-মশা হয়ে জন্মানোর জন্য অপেক্ষা করতে হত না। মহান বামপন্থীরা আজকাল গোলমেলে শ্রেণিসংগ্রাম সরিয়ে জাতিসত্তা আন্দোলনের সমর্থক, সিপিয়েম বাচস্পতিরা 'বহুত্ববাদ' নিয়ে বাতেলা ঝাড়ছেন! (সর্বহারা শ্রেণির মানুষ যেহেতু সংখ্যাবহুল তাই তাদের ভ্যানগার্ড পার্টি যা বলবে সেটাই বহুত্ববাদ, এইরকম কোনো যুক্তিতে নিশ্চয়!) সাধারণ মানুষের, মেহনতি জনতার এই 'যখন যেমন তখন তেমন জাতি সংজ্ঞা' তাঁরা বোঝেন না, তা তো নয়, 'রাজনীতি করেন' এবং সেটা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মতোই কিছুতেই জাতপাতের রাজনীতি নয়! হোত্-ত্তেই পারে না। আমার এই 'মহান' প্রবন্ধের মান ক্রমশ নিম্নগামী বেশ বুঝতে পারছি কারণ 'খেলো রাজনীতি'র কথা বলে চলেছি, অবশ্যই তাই। *Orientalism*-এর ভূমিকায় এডওয়ার্ড সইদ পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন— "এখানে আমি যা দেখাতে আগ্রহী তা হল, বিশুদ্ধ জ্ঞান মৌলিকভাবে অরাজনৈতিক (এবং বিপরীতক্রমে খুব বেশি রাজনৈতিক জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নয়), এই সাধারণ উদারতাবাদী

ধারণা কিভাবে জ্ঞান-সৃজন মুহূর্তে বলবৎ ও গোপনে সুসংগঠিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আড়াল করে রাখে। আজকাল কাউকে সহজে বুঝতে দেওয়া হয় না যে, 'অরাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ভান করা' নীতিকে ভাঙ্গার দুঃসাহস নিয়ে কিছু রচিত হলে সেই রচনাকে ছোট করবার জন্য 'রাজনৈতিক' বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়। [...] ভারত ও মিশর সম্পর্কিত সকল প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান কোনো-না-কোনোভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা রঞ্জিত, প্রভাবিত এবং দূষিত।" যদিও এই কথাটার অর্থ সংকুচিত করে পার্টিবাদীরা নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নেন।

পুরাণ প্রসঙ্গে ফেরা যাক, প্রাচীন মেসোপটেমীয় *এপিক অভ গিলগামেশ*-এর অন্যতম চরিত্র **এনকিদু**, যাকে দেবতা **এনকি** সৃষ্টি করেন। সেই পুরাণে এনকিদুর অর্ধ শরীর মহিষের ন্যায় মহিষের শিংযুক্ত। এই কাহিনি সুমের কবিতা থেকে অক্কাদীয় মহাকাব্য হয়ে পুরোনো ব্যাবিলোনিয়ান ভাষা পেরিয়ে অসুরীয় রাজা অসুর বনিপালের গ্রন্থাগারের ধবংসাবশেষ থেকে কিছু অংশ উদ্ধার হয়। এনকিদু হলেন সংস্কৃতিবান নগর সভ্যতার প্রতিভূ যোদ্ধা রাজা গিলগামেশের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রাকৃত বন্যতার প্রতিভূ, তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতেন। এক ব্যাধ দেখে ফেলে যে এনকিদু তার ফাঁদ থেকে পশুপাখিকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। সে রাজা গিলগামেশের কাছে এর বিহিত চায়। গিলগামেশ, শামাৎ নামে এক দেবদাসীকে পাঠান এনকিদুকে বশে আনতে। শামাৎ-এর রূপ ও ছলাকলায় মুগ্ধ এনকিদু টানা সাতদিন তার সঙ্গে সঙ্গম করার পর পশুপাখিদের কাছে ফিরলে মানুষের গায়ের গন্ধে তারা পালিয়ে যায়। একাকী দুঃখী এনকিদুকে

শামাৎ সভ্য জগতে উরুক শহরের রাজা গিলগামেশের কথা শোনায় আর সেখানে নিয়ে যায়। এনকিদু ছিলেন গিলগামেশের সমকক্ষ, ওই গাথায় মল্লযুদ্ধের পর তিনি গিলগামেশের পরম মিত্র হয়ে যান, তাঁর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত গিলগামেশ অমরত্বের সন্ধানে উৎনাপিসতিম-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন।

২২০০ খ্রিস্ট পূর্বের একটি অক্কাদীয় এম্পায়ার সিলে (উপরের চিত্র) এনকিদুকে দেখা যায় এক সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে, সেই সিলের পাশেই রয়েছে গিলগামেশ স্বর্গীয় ষণ্ড গুলান্না-র সঙ্গে লড়াই করছেন। এখানে এনকিদুকে দেখে মহিষাসুর ও দুর্গাবাহন সিংহের লড়াই বলে মনে হবে। **এনকিদু** দেবী **ইস্তার**-এর রোষে অসুস্থ হয়ে মারা যান। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একটি সিলে (1357) কিন্তু একই অবিকল এনকিদু বা মহিষাসুরকে দেখা যায় বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে, ভারতীয় সিলে সিংহের বদলে বাঘ থাকবে, এটা খুব স্বাভাবিক। দুর্গাও বহুস্থলে ব্যাঘ্রবাহিনী বা শেরাওয়ালি, মহেঞ্জোদারোর এই

সিন্ধু সিল 1357

সিলকে অক্কাদীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার সংযোগের প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়। পৌরাণিক গল্প কাহিনি বা কোনো প্রাচীন ঘটনা সূত্রের যোগাযোগ হিসেবেও ভাবা যেতে পারে। সিন্ধু বিশেষজ্ঞ ইরাবথম মহাদেভান মহেঞ্জোদারোর এই সিলের মূর্তিকে দ্রাবিড় 'পুলিকাদিমাল'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন যার অর্থ 'ব্যাঘ্রসংহারী-বীরপুঙ্গব' (tiger killing hero)।

সিন্ধুসভ্যতার সিলমোহরে মহিষাসুর প্রসঙ্গে আসবার আগে মিশরীয় সভ্যতার মহিষাসুর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলে নিই।

দেবী ইস্তার, অক্কাদীয় সিল খ্রি পূ ২৩৫০-২১৫০

রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মিশরে চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের এক কবি ছিলেন নোনুস অভ প্যানোপলিস, তাঁর রচিত *Dionysiaca* যা ডায়ানোসিয়াসের ভারত অভিযান ও প্রত্যাবর্তন কাহিনি, ওই সময়ের (Greek Antiquity/Classical Era) সংরক্ষিত রচনার মধ্যে সর্ব্বৃহৎ—প্রায় ২০৪২৬ পংক্তির ৪৮টি অংশে বিভক্ত তার ৩৬ তম অংশের ২৪১—২৫৬ লাইনে Colletes-এর কথা

আছে, নয় কিউবিট মানে প্রায় চোদ্দো ফুট উচ্চতার বিশালদেহী যোদ্ধা, ২৫১-২৫২ লাইনের ভারী চমৎকার তথ্যের ইংরেজি অনুবাদ— "Such was **Colletes**, gigantic heavenhigh having in him the sacrilegious blood of **his giant ancestor the founder of the Indian Race**!"

এই **কোলেটেশ**কে ব্যাকাসের নাচের দলের এক মেয়ে তীক্ষ্ণ পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল! কয়েক পাতা আগে আর এক বীর **মররেহুস**কে (সান্ড্রাকোটাস চন্দ্রগুপ্ত হলে এ নিশ্চয়ই মহিষাসুর) এক সুন্দরী তার নগ্ন রূপ দেখিয়ে বর্ম অস্ত্র সব খুলিয়ে নেয়, তারপর চূড়ান্ত মুহূর্তে একগাদা সাপ তার শরীর থেকে বেরিয়ে মররেহুসকে হত্যা করে।

এটিকে বাদ দেওয়াই যায় প্রসঙ্গ থেকে, কিন্তু বাঙালির লোকশিল্পে সরাসরি মিশরীয় প্রভাব ব্যক্ত করেন সুধাংশুকুমার রায়—বহু শব্দ, স্থাননাম, লোকশিল্পের নমুনা, সেঁজুতি ব্রতর আলপনা ইত্যাদি উদাহরণ দিয়ে তিনি বঙ্গদেশের সঙ্গে মিশরের প্রাচীন সম্পর্ক ব্যক্ত করেন। তাঁর *Prehistoric India and Ancient Egypt* নামক ৫২ পাতার পুস্তিকায় তিনি দাবি করেন রাজমহল পাহাড় এলাকায় মিশরের বিতাড়িত **ফ্যারাও আখেনাতন** ও তাঁর জামাতা সামেনখারার মমি সংরক্ষিত আছে সামেনখারা দ্বারা বঙ্গভূম অধিকৃত এবং শাসিত হয়। আখেনাতেন প্রথম মনোথেইস্ট সূর্য-পূজক, তাঁর বার্ষিক মৃত্যুদিবস পালনের অনুষ্ঠান হল আমাদের গাজন সন্ন্যাসীদের অশৌচ পালন ও অন্যান্য আচার। তাঁর বক্তব্য মিশরীয় **'ডো-আহোম-রা' শব্দ থেকে ধর্মরাজ** শব্দের উৎপত্তি, এটা পড়লে মাথায় আসতে

নেরমার প্যালেট

পারে ধন্মঠাকুরের ঢিবি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত বৌদ্ধ-স্তূপের বদলে পিরামিড। ধর্মরাজের বাহন মহিষ। সুধাংশুকুমার রায় তাঁর পুস্তকে 'নেরমার প্যালেট'-এর চিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ইটের প্রাচীর ঘেরা, মাঝে দুর্গযুক্ত নগর, সিন্ধু সভ্যতাকে চিহ্নিত করে (চিত্রের নিম্নাংশ)। ফ্যারাও-এর মহিষরূপ প্যালেটের উপরের মহিষের মোটিফ, মহিষাসুরকে মনে পড়তেই পারে, কিন্তু সুধাংশুকুমার রায় ওই পুস্তিকায় সরাসরি মহিষাসুরকে নিয়ে কিছু বলেননি। ওপরের ছবি গড-কিং মহাদেব আর পেছনে পাদুকাবাহক মুণ্ডিত-মস্তক বামুনের কথা মনে করায়। নেরমার প্যালেট নিয়ে

নেরমার প্যালেটের নিম্নাংশ

পণ্ডিতদের মাঝে মতভেদ আছে, অনেকের মতে এটি কোনো বাস্তব ঘটনার চিত্র নয়, প্রচলিত কাহিনীর চিত্ররূপ। কে জানে মহিষাসুরের গল্প সে দেশেও গেছিল কিনা! সুধাংশু কুমার রায়ের কথা পণ্ডিত মহলে একেবারেই পাত্তা না-পেলেও ডক্টর অমলেন্দু মিত্র, *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর* গ্রন্থে ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর করে এই সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। ভুললে চলবে না, মিশরীয়দের যুদ্ধ-দেবী **শেখমেত**-এর মাথা সিংহীর। মিশরীয় যোগাযোগ নিয়ে সুধাংশু কুমার রায়ের প্রদর্শিত এই পথে লোকশিল্পের গবেষকেরা অনেকেই মাথা ঘামিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শিল্পক্ষেত্রে মিশরীয় যোগাযোগ ছিল বলে মনে করতেন।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* গ্রন্থের ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি সম্বন্ধেও একটা কথা মনে হয়। 'মহিষ' কথাটি বেদে মহিষ পশু, এই অর্থে যেমন ব্যবহৃত দেখা যায় তেমনই সায়নাচার্য কোন কোন স্থলে (ঋগ্বেদ ৮।১২।৮) 'মহিষ' শব্দটি মহান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন সেক্ষেত্রে মহিষাসুর কথার অর্থ মহান অসুর। দেবী হয়ত মূলে **মহান অসুর** মর্দন করিয়াই **মহিষাসুরমর্দিনী**, মহান অসুরই পরবর্তী কালে পশু, মহিষের মূর্তি ধারণ করিয়াছে। আমরা চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাষাসাহিত্যগুলিতে যত কাব্য দেখিতে পাই সেখানে সাধারণতঃ মহিষাসুরকেই প্রধান করিয়া দেখিতে পাই। [...] দেবীর যত অসুরনাশিনী প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায় তাহা সর্বত্রই মহিষাসুরনাশিনী বা মহিষমর্দিনী রূপ। মহিষমর্দিনী দেবী সম্বন্ধে আর-একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়।

এই মতে দুর্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের **ব্যাইর্গো** (Virgo) দেবী—ইনি সমরপ্রিয়া দেবী। এই ভূমধ্যসাগরাঞ্চলবাসীগণ কর্তৃক মনখমের জাতির বিজয়ই মহিষমর্দিনী দেবীর মূর্তির মূল কথা। মনখমেরগণ একটি মিশ্র জাতি, খানিকটা ক্যাম্পিয়ান, খানিকটা অস্ট্রালয়েড, কিছুটা অ্যালপাইন। ইহাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মহিষের একটা বিশেষ যোগ ছিল। ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে গো যেরূপ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল, মনখমেরগণের মধ্যে মহিষও সেইরূপ পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মনখমের মর্দনই হইল মহিষমর্দন ভূমধ্যসাগরীয়গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাইর্গো বা দুর্গা তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মনখমের-বিজয়ই রূপ ধারণ করিল দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তিতে।”

‘মন্-খেমর’ অর্থ, অস্ট্রএশিয়াটিক বা মুন্ডা, খাসি ইত্যাদি ভাষাভাষী। শব্দকল্পলতিকা-য় পাই ‘অসুর’-এর একটি নাম ‘পূর্বদেব’। ‘পূর্ব’ অর্থ, ‘দিক’ বা ‘প্রাচীন’, দুটিই হতে পারে।

সিন্ধু সিলমোহরে মহিষাসুর এবং হুবিস্কের মুদ্রা

সিন্ধু সিলমোহরের মধ্যে যেটিকে **পশুপতি** সিল বলা হয় সেটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ডানদিকে একটি আক্রমণোদ্যত বাঘ, বাঁদিকে একটি মহিষ, পশুপতির মাথায় মহিষ-শৃঙ্গের মুকুট—এই পশুপতিকে **মহিষাসুর** মনে করার সংগত কারণ আছে। (গিলগামেশের উপাখ্যানের এনকিদু ও তৎসংলগ্ন মহেঞ্জোদারো সিল দ্রষ্টব্য) বিদেশি পুরাণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে প্রত্ন-ইতিহাস নিয়ে কথা বলতেই হচ্ছে, যদিও এপ্রসঙ্গ অনেক বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে।

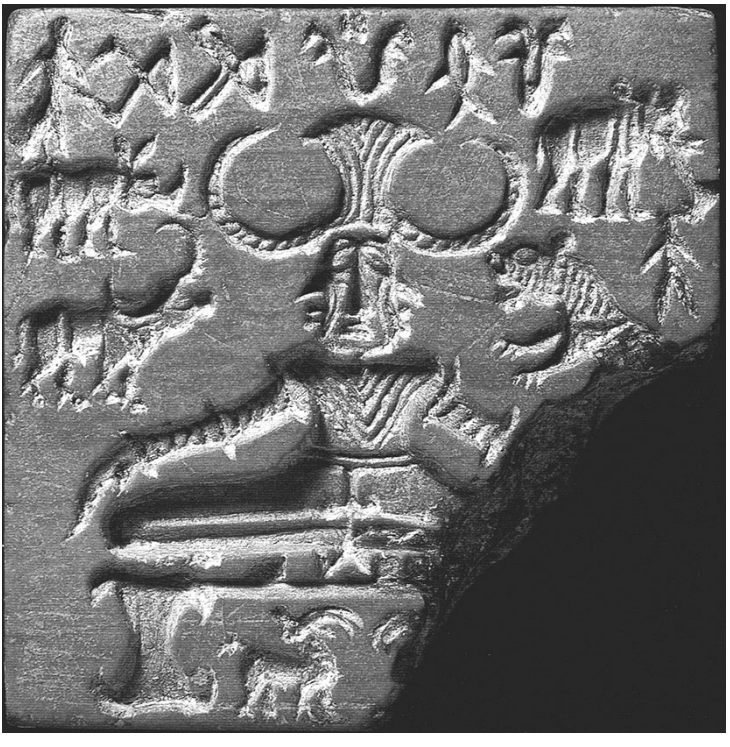

পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর *পূজা-পার্বণের উৎসকথা* গ্রন্থে মহিষাসুরমর্দিনীর প্রত্ন-ইতিহাস নিয়ে অনেকটা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহরে কোনো সিংহ নেই কারণ তখন ওই অঞ্চল জলা-জঙ্গল হওয়াই স্বাভাবিক, তাই হাতি গন্ডার মহিষ বাঘ কুমির প্রভৃতি সেখানকার চিত্রে থাকলেও মরুবাসী সিংহ নেই, সেই জায়গা নিয়েছে বাঘ। স্বাভাবিকভাবে দেবীমূর্তি কল্পনায় বাঘের ভূমিকা সিলমোহরে পাওয়া যায় (চিত্র-A)। পশু সম্পৃক্ত ধর্মবিধি ও বিশ্বাস আদিম টোটেম বিশ্বাসের ধারা অনুসারী। এক একটি গোষ্ঠী নিজেদেরকে

একটি প্রাণীর উত্তর পুরুষ হিসেবে প্রাচীনকালে কল্পনা করত, উত্তরকালে সেই প্রাণীগুলি গোষ্ঠীর প্রতীকী পবিত্র পশু বা টোটেমে পরিণত হয়। ব্যাঘ্র কাল্ট, হস্তী কাল্ট, বৃষ কাল্ট, মহিষ কাল্ট। বাঘকে নিয়ে সিন্ধুবাসীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল্ট গড়ে উঠেছিল, যারা ছিল মাতৃকা-উপাসক। আদি ক্ষমতাধর মহিষ কাল্টের উপাস্য দেবতা ছিলেন পুরুষ। দু-একটি সিলমোহরে বাঘের মাথায় একজোড়া করে সিং খোদাই করা থাকলেও সেগুলি মহিষের নয়, বৃষের, ব্যাঘ্র কাল্ট ও বৃষ কাল্টের অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলত, এগুলো তারই প্রমাণ। মহিষ অনুগামীদের সঙ্গে ব্যাঘ্র কাল্ট অনুগামীদের সম্পর্ক সেরকম সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। মহিষ শৃঙ্গধারী পুরুষ মূর্তির সঙ্গে বাঘের লড়াই সে কথাই বোঝায়।

'প্রত্নতত্ত্বে মহিষমর্দিনী' অংশে পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন—"দেবী-ব্যাঘ্র সমন্বিত মূর্তিতে (চিত্র-A) দেবীকে যে বিশেষ ভূষণে, কেশবিন্যাসে আমরা দেখেছি, ঠিক সেই বিশেষ ভূষণ এবং কেশ-বিন্যাস সমৃদ্ধা কয়েকটি নারী-মূর্তির (দেবী?) সঙ্গে

A

B

প্রবলভাবে সংগ্রামরত একটি ক্রুদ্ধ মহিষকে দেখা যাচ্ছে, আর একটি সীলমোহরে (চিত্র-B) মহিষের আক্রমণে এই দেবী-তথা-নারীরা বিপর্যস্ত। ঐ দেবীরা ঐ বিশেষ ধাঁচের বসন-ভূষণের কারণে ব্যাঘ্র-কাল্টের সঙ্গেই সম্পৃক্তা ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে নির্দ্বিধায় অতএব এই মোহরটিকেও দুই কাল্টের সংগ্রামের সূচক বলে মনে করতে পারি অনায়াসেই। এর পরবর্তী ছবিতে তীক্ষ্ণাগ্র বল্লমের আঘাতে মহিষকে বধ করা হচ্ছে (পাশে মহিষ-শৃঙ্গধারী **পশুপতি বা মহিষাসুর**, উপরে গোধিকা চিত্র-C) স্মরণযোগ্য যে, পরবর্তী-কালের মূর্তি-কল্পনাতেও দেবী মহিষাসুরকে বধ করছেন ভল্ল বা ত্রিশূলের আঘাতে, এই রকমই দেখা যায়!

তাহলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সীলমোহরগুলিকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু রাষ্ট্রের দুই পরস্পর বিরোধী টোটেম-অবলম্বী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বই কালক্রমে ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী কর্তৃক মহিষরূপী দেবতার হত্যার মীথে পরিণত হয়েছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ-প্রথিত মহিষাসুর-মর্দিনী মীথের আদি উৎস ঐ খানেই। [...] মেসোপটেমিয়া থেকে সিন্ধুতীর পর্যন্ত

C

যে মহামাতৃকা দেবীর আরাধনা করা হতো ইতিহাস-পূর্বকালে তিনি বহুরূপে কল্পিতা হয়েছিলেন— কখনো **সিংহবাহিনী সিবিলী**, কখনো ব্যাঘ্রবাহিনী সৈন্ধবী দেবী (কি তাঁর নাম ছিল? উম্মু? উমা?) কখনো বা আর কিছু। বাঘ-সওয়ারী দেবী পরে আবার বহু ক্ষেত্রেই সিংহ সওয়ারী হয়েছেন, যখন আর্যভাষী বৈদিকরা নিজেদের দেবকুলকে সিন্ধুজলে বিসর্জন দিয়ে পরাভূত সৈন্ধবীদের দেব-দেবীদেরই শিরোধার্য করে নিয়ে হিন্দুধর্মের ('সিন্ধু' ধর্মের?) প্রবর্তন করলেন। সিন্ধুর মাতৃকাদেবীর মতো, সিন্ধুর আদি শিবও তাঁদের প্রধানতম দেবতা হলেন: দেবাদিদেব, **মহেশ্বর** (মহিষ ঈশ্বর?) **মহিষ-শৃঙ্গধারী সৈন্ধবী শিবমূর্তি পরিবর্তিত হল মহিষ-শৃঙ্গতুল্য চাঁদের ফালির শিরোভূষণ-সম্পন্ন 'হিন্দু' শিবের রূপে**। কালিকাপুরাণ মতে, শিবই যে মহিষাসুররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কাহিনীর উৎসেও কি মহিষকাল্টের সঙ্গে শিবের সংযোগ আছে? চণ্ডীর পদতলে মহিষাসুরের পড়ে থাকার আরেক রূপই কি কালিকার পদতলে শিবের পড়ে থাকা? [...] প্রাচীন সিন্ধু রাষ্ট্রের ব্যাঘ্র-কাল্ট-অনুসারী মাতৃকা উপাসকরা মহিষ-কাল্ট-অনুসারী পিতৃদেবতা পূজকদের পরাস্ত করেছিল [...] দেবীর পদতলে মহিষাসুর (তথা শিব) পড়ে আছেন এই ভাব-কল্পনা ঐ জয়-পরাজয়েরই দ্যোতনা বহন করেছে উত্তরকালে। এ জিনিষ প্রাচীন পৃথিবীর অন্যত্রও ঘটেছে। মিশরবিদ্যাবিদ মবেট এবং ডেভি দেখিয়েছেন কেমন করে বাজপাখি-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক অন্যান্য টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীকে পরাভূত করার ইতিহাস ব্যঞ্জিত হয়েছে, বাজপাখির পায়ের তলায় আর সব প্রাণী পড়ে আছে এই রকম খোদাই

মূর্তিতে, যা প্রাচীন মিশরের প্রত্ননিদর্শের মধ্যে বহুল সংখ্যাতেই পাওয়া গেছে। মবেট এবং ডেভি বাজপাখির প্রতীকে হোরাস দেবতা-পূজকদের বিজয় কাহিনীর সাক্ষ্য হিশেবেই সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন। হোরাস উপাসক রাজা মেনেসের বিজয়কথা সেগুলি।" (*পূজা পার্বণের উৎসকথা* পৃ ৯৬-৯৭)

এই সূত্রে সিন্ধু সিল M-305 এ মহিষ ও ব্যাঘ্র-কাল্টের মিশ্রণ লক্ষ্য করেছি (চিত্র-D)। সেখানে পল্লব সেনগুপ্ত কথিত মাতৃদেবীর ন্যায় হস্ত ও কেশবিন্যাসের একজন, পশুপতি বা মহিষাসুর সিলের মতো যোগীমুদ্রায় বসে রয়েছেন। মাথায় রাজকীয় শিরস্ত্রান বদল হয়েছে, মহিষশৃঙ্গের সাথে চিত্র-A-এর মতো একটি বৃক্ষশাখা যুক্ত হয়েছে। গায়ে বর্ম বা আসন নেই। শৃঙ্গের মাঝে দুটি তারকা ও পাশে মৎস চিহ্ন রয়েছে। এটি মহিষ কাল্টের উপর ব্যাঘ্র-কাল্টের আধিপত্যের বা সমতাবিধানের বা ক্ষমতাদখল বা বিবাহের নিদর্শন হতে পারে।

সিন্ধু সিল M-305

কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়ে দুর্গা কীভাবে শিবের বউ হয়ে গেলেন সেটা বুঝতে চেষ্টা করলে গম্ভীরার তামাশা ধরনের ভাবনা এসে যায়, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী হলেও হয়তো দুর্গতি আনেন শিবের জীবনে। শিবকে উমার দেওয়া গঞ্জনার

কথা আমরা সবাই জানি। দুর্গার হাতে বিষ্ণুর চক্র দেখে সন্দেহটা ঘনীভূত হয়, কে জানে চক্করটা কী! সেই ছোট্ট থেকে শুনছি 'নারায়ণী নারায়ণী'! দেবীপুরাণের মতো ঝগড়াঝাঁটি, সেপারেশন অব্দি গড়িয়েছিল কিনা কে জানে! এখনকার মতোই দুর্গার পেছনে মদতদাতা দেবতা কয়েকজন জুটে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। শেষে তো দুর্গা মহিষাসুরের বুকে ত্রিশূল ধরে থাকে—কে জানে তার অস্ত্রেই তাকে বধ নাকি! ছেলেমেয়েরাও তো মায়ের পাশেই দাঁড়িয়ে—নাঃ, এটা বাড়াবাড়ি! তার চেয়ে ওই ঝগড়া-মারামারি, ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসা, নালিশে-নালিশে বরকে অত্যাচারী অসুর প্রতিপন্ন করা, তারপর ক-দিন বাদে আবার ঘরের বউ ঘরে ফেরা—এইটা ঠিক আছে! অবশ্য শিবের সঙ্গে দুর্গার বিয়ের ব্যাপারটা প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে খুঁজতে গেলে কুষাণ রাজারা দিয়েছিলেন বলতে হয়। পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন **ননা**। হেরোডোটাস, স্ট্রাবো—দুজনেই এঁর উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রতীক ছিল সিংহ, এই দেবীকে কুষাণ যুগের মুদ্রায় বারবার দেখা যায়। দ্বিতীয় কদফিস তাঁর অনেক মুদ্রায় '**মহেশ্বর**' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় দেবতা শিবকে কুষাণ রাজাদের বেশ পছন্দ ছিল। খুব সম্ভব সেখান থেকেই পশ্চিম এশিয়ার দেবী ননা ভারতীয় মহাদেবের সঙ্গিনী হয়ে যান। এটি মূলত ঘটে হুবিষ্কের দুটি মুদ্রার মাধ্যমে, একটায় দেখা যায় Oesho (Bhavea=iva) আর Nanna-কে, আরেকটিতে Oesho-র সঙ্গে Ommo বা উমাকে। ননা-দেবীর সিংহ হয়তো শিবের স্ত্রী দুর্গা বাহন হিসেবে দখল করেন। অবশ্য কুষাণদের কিছু আগেও এই চিহ্নিতকরণ

হুবিস্ক-র মুদ্রা

হয়ে থাকতে পারে, কারণ Azes-এর কিছু মুদ্রায় **অম্বা**-র সঙ্গে সিংহ দেখা যায় আর অম্বাকে দুর্গার রূপ বলেই মনে করা হয়। (see 'AMBA-NANA-DURGA' by Bandana Saraswati, Journal of Asiatic Society, Vol VII Nos.1&2, 1965)

মহাবলিপুরমে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত মহিষাসুরমর্দিনী গুহামণ্ডপে যে মূর্তি আছে সেখানে দেবী অষ্টভুজা। যেটি মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধদৃশ্য, দেবী সিংহারূঢ়া, মহিষাসুরের মাথাটি কেবলমাত্র মহিষের। আমার আশ্চর্য লেগেছে, এই

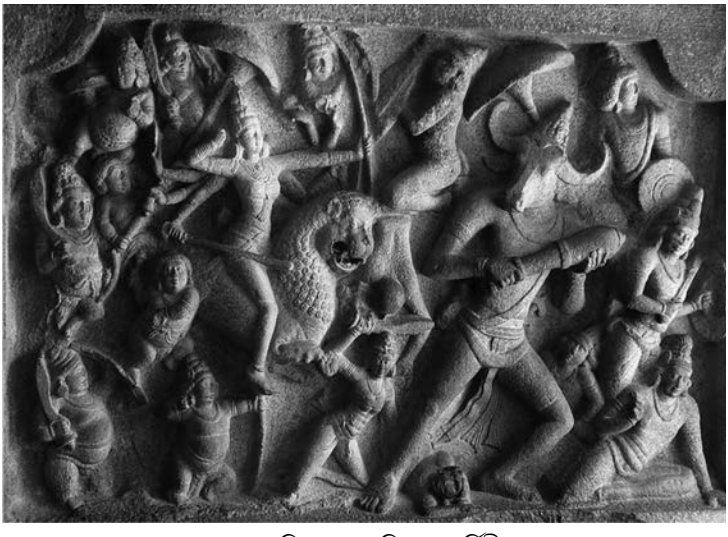

মহাবলিপুরমে মহিষাসুরমর্দিনী

মূর্তিতে অসুরদের শারীরিক গঠন তথাকথিত দেবসুলভ বা দেবী-সদৃশ অনুরূপ সুঠাম দেহসৌষ্ঠবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বরঞ্চ দেবীর সাহায্যকারীরা বামন আকৃতির বিকৃত শারীরিক গড়নের, এরা শিবানুচর প্রমথ-গণ হতে পারে, কিন্তু এরকম মূর্তি বানানোর শৈল্পিক-যুক্তি কী হতে পারে, সেটি ভাববার বিষয়। মহাবলিপুরম যাঁর নামাঙ্কিত সেই মহাবীর অসুররাজ বলি-কেও বিষ্ণুর বামন অবতার দ্বারা প্রতারিত হতে হয়েছিল। এই মহিষাসুর ও তাঁর সঙ্গীদের কাদের প্রতীক হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল কে বলতে পারে! যুগে যুগে আমাদের পুরাণ-ইতিহাসে পরতের উপর পরত লাগানো হয়, ভাষ্যে গল্পে শিল্পে—হয়তো এই খোদিত শিল্পসকল সেই ইতিহাসকে সাংকেতিকভাবে ধরে রাখে। এই মণ্ডপ পল্লব রাজাগণের সময় নির্মিত।

বৈদেশিক পুরাণে মহিষাসুরকে খুঁজলাম অথচ ভৌগোলিকভাবে সবচেয়ে কাছাকাছি, দেবাসুর প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি আলোচিত পারসিক 'আহুরা-মাজদা'-কে নিয়ে কথা বলা হোল না, তার একটাই কারণ এই প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ, ভাষাতাত্ত্বিক ও সিন্ধু-প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ সহ আলোচনা করা দরকার যে এখানে মুলতুবি রাখা ভালো। এবিষয়ে লেখাপত্র যথেষ্ট সহজলভ্য। এছাড়াও আমার খানিকটা মন-গড়া ধারণা, সম্পূর্ণ মেসো-আমেরিকা সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সমস্ত সভ্যতার পুরাণ কাহিনিতে প্রাপ্ত মহাপ্লাবনের পূর্বে এবং পরে পৃথিবী জোড়া উন্নত নগর-নির্মাণ কৌশলী সভ্যতা ছিল আর তাদের মধ্যে আধুনিককালের মতোই পারস্পরিক বাণিজ্য ও প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ছিল। আর এই ধারণা আদ্যন্ত ভারতীয়, যেখানে ইতিহাস কাল বা সময় ধারণা সরলরৈখিক নয়, চক্রাকার এবং মহাকাল স্থির।

পল্লব সেনগুপ্তের কথা ধরে প্রসঙ্গে ফিরে আসি— "দুর্গার অবলীন যে আরণ্যক আদিম দেবীর হদিশ মিলছে, তিনি তাহলে কে? প্রাগার্য অস্ট্রিক আদি জাতিদের ওরাওঁ কোমের কোনো-কোনো শাখায় **চাণ্ডী** বা চান্দী নামে এক দেবীর পূজার প্রচলন এখনও দেখা যায়। বাংলার **মঙ্গলচণ্ডী** এর থেকেই রূপান্তরিত হয়ে এসেছেন এমন সিদ্ধান্ত কেউ-কেউ করেছেন। ইনি গোধিকা অর্থাৎ-গোসাপে অধিরূঢ়া চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-কাহিনীতে দেবীর গোসাপমূর্তি ধারণ ঐ টোটেম-বিশ্বাসেরই একটি অপ্রচ্ছন্ন রূপ। অরণ্যচর ব্যাধ কালকেতুর মাধ্যমেই যে দেবীর পূজা নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ঘটনার অন্তরকাঠামোও

উদয়গিরির গুহামূর্তি

ঐ কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। মাতৃকাদেবী হিশেবে পরে ঘট প্রতীকে ঐ চান্দী তথা তার জনপদ-রূপ-মঙ্গলচণ্ডী উপাসিতা হতে আরম্ভ করেন এটাই, তাহলে স্বাভাবিক। চণ্ডীমঙ্গলের গল্পে, অরণ্যচর ব্যাধ ওই দেবীর দাক্ষিণ্যে শিকার সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে, আবার 'নগর পত্তনের পর 'বুলান মণ্ডল'-ও চাষবাস শুরু করছে তাঁর কৃপায়। একই সঙ্গে শিকার ও শস্য এদুয়ের অধিষ্ঠাত্রী

চাণ্ডী-তথা-চণ্ডী এই বিবর্তনের পথ ধরেই দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন উত্তরকালে"। (*পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পৃ ১০০)

বাঙালির দুগ্গাপুজো বা শারদোৎসব

কিন্তু মহিষাসুরের কালে তো বাঙালি জন্মায়নি, দেশের নাম হিসাবে 'বঙ্গ' সরকারিভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল শাসনকালে। যদিও কালিদাসের রঘুবংশে দেশের নাম বঙ্গ আর তার অধিবাসীরা বঙ্গাল। অবশ্য মহিষাসুর বঙ্গীয় হতেই পারেন, কারণ অনেকের মতে বঙ্গ শব্দটি এসেছে বোঙ্গা থেকে, যার অর্থ দেবতা। বোঙ্গা > বঙ্গ = দেবভূমি। পৌরাণিক কালে বঙ্গদেশে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দুর্গাপূজা করেছিলেন বলে কথিত আছে। তারপর কেউ বলেন তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, কেউ বলেন দিনাজপুরের রাজা গণেশ প্রথম মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে দুর্গাপূজা করেন। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত 'ইভেন্ট' দুর্গোৎসব-এর সূচনা যে বাঙালির জীবনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অবদান সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এবং তার পশ্চাদপটে মুসলমান শাসনমুক্ত হবার সাময়িক বোকা-বোকা আনন্দ যে ছিল তা অনস্বীকার্য।

সনাতন ধর্মের একটা তাল-খিচুড়ি রিলিজিয়ান মাফিক রূপ দেওয়ার রাজনৈতিক চক্রান্ত ঐতিহাসিক কাল থেকেই ভারতবর্ষে চালু আছে, এখন বর্তমানে যা নগ্নভাবে প্রতীয়মান কিন্তু হিন্দু ধর্মকে কালচার না-ভেবে রিলিজিয়ন রূপ দিতে গেলে মেনে নিতে হয় বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য প্রত্যেকটি আলাদা-আলাদা রিলিজিয়ন। একসঙ্গে ঘেঁটে হিন্দু-

রিলিজিয়ন বলে দেওয়ার অধিকার সেক্ষেত্রে থাকে না, কারণ পুরাণ-ভর্তি বিষ্ণুপন্থী আর শিবপন্থীদের মারামারি-কাটাকাটি, শিবপন্থীরা রাক্ষস অসুর ইত্যাদি অশুভ শক্তি আর দেবতাদের পক্ষে বিষ্ণু অবতার পশুরূপী বা মনুষ্য জন্ম নিচ্ছেন। মনুষ্য জন্ম নিয়েছেন বলেই তিনি যেন মানুষের পক্ষে, দেবতাদের স্বর্গ পুনরধিকার করার জন্যই যে অবতার জন্ম তা যত পরিষ্কার করেই লেখা থাক সেসব কথার কোনো মূল্যই যেন নেই! যে কারণে আজও "জয় শ্রীরাম" বলে বানরসেনার মতো দাঙ্গাবাজি করা যায়। রাম তো মানুষ, জন্মগ্রহণ দেবতাদের ষড়যন্ত্রে, সারা জীবন দুঃখ কষ্ট ভোগ তা-ও দেবতাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, এমনকি বৃদ্ধাবস্থায় একমাত্র প্রিয়জন লক্ষ্মণকে ত্যাগ বা মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হন দেবতাদের ষড়যন্ত্রে এবং অবশেষে উপায়ান্তর না-দেখে সরযূর জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন! আত্মহত্যাকে 'প্রাণবিসর্জন' বললেই তো ঘটনাটা বদলে যায় না। কেন বলা যাবে না বাঙালি **রাবণ**কে শত্রু বা খারাপ বলে ভাবেনি কখনো, বাঙালি কৃত্তিবাস রামায়ণের যে অনুবাদ করেন সেখানে রামকে শত্রুরূপে ভজনা করবার জন্যই রাবণের জন্ম ও কর্ম, বাঙালির কাছে বিভীষণ ঘরশত্রু, হনুমান তার দেবতা নয়—যে হনুমান ইন্দ্রজিতের বৈদিক নিকুম্ভিলা যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য যজ্ঞ বেদিতে প্রস্রাব করে, এছাড়া রাবণের **অম্বিকা** অর্থাৎ দুর্গাপূজায় হনুমান চণ্ডীর পাতা ছিঁড়ে পুজো বন্ধ করে দেয়—এসব কাণ্ডের সঙ্গে বর্তমানে রাজনীতি-করিয়ে হনুমানদের কর্মকাণ্ডের আশ্চর্য মিল। বাঙালি রাবণবধের সময়ের উত্তর ভারতে হিন্দু পালনীয় তিথি, উৎসবগুলোকে বদলে নিয়েছে। যেমন এখন তার সবচেয়ে

বড়ো উৎসব দুর্গাপূজা মহিষাসুরমর্দিনী রূপে যেখানে রাবণবধ বা দশেরার চিহ্নমাত্র নেই। দুঃখ আছে মেয়ে বা মা বাড়ি ফিরে যাবেন বলে, দশেরার উল্লাস নেই। মদ-মাংসের মহোৎসব আছে কিন্তু অষ্টমীতে নিরামিষ ছাড়া কোনো উপবাস কৃচ্ছ্রসাধন নেই। পরবর্তী সারা ভারতের প্রায় সব ধর্মের ও আঞ্চলিক পুণ্য তিথি উত্তর ভারতীয় হিন্দুদের দেওয়ালি বা রামের অযোধ্যায় ফেরার দিন, বাঙালি সেটাকে তার কালীপুজো বানিয়ে নিয়েছে, যতই এখন ধনতেরাস করে, লক্ষ্মীপুজো করে, দিওয়ালি মানানো হোক, কালীপুজো কালীপুজোই থাকবে, শ্যামাপূজা শক্তি আরাধনা যেখানে স্বয়ং শিব তাঁর পায়ের তলে শুয়ে থাকবেন।

ভক্তিমন্ত বাঙালির ঘরে ঘরে দুর্গাপূজার গল্প বিশ্বাস করতে গেলে, তার একটি কারণ হিসাবে ১২৪০ সালের ২৭ আশ্বিন তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত একটি সংবাদকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। "এই সপ্তাহে আমরা যে এক পত্র প্রকাশ করিলাম, তাহাতে অধিক রাত্রিযোগে গৃহস্থ লোকেদের দ্বারে দ্বারে দেব প্রতিমা বিশেষতঃ দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া দেওয়ার যে অতি কদর্য্য ব্যবহার দিন দিন বর্ধিষ্ণু হইতেছে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। তাহার অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক গৃহস্থই এই পূজা করেন। আমাদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়ের বুঝি এতদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকিবেন অতএব লিখে যে এতদ্ক্রমে কোন গৃহস্থের দ্বারে অশিষ্ট যবিষ্ট ভুয়িষ্ট দুষ্ট কর্ত্তৃক প্রতিমা নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা লইয়া ঐ গৃহস্থের পূজা না করিলে নয়। ঐ উৎসব সময়ে সুতরাং বামুন ভোজনাদি কর্ম্মে নানা ব্যয় করিতে হয়। অতএব বিধি বোধিত পূজার ন্যায় এই পূজা না করলে লৌকিক

অসম্মান আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক গণ্ডগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রূপে অর্থ দণ্ড করা হয়। প্রতিমা অধিক রাত্রিযোগে তাহার দ্বারে নিক্ষিপ্ত হইলেই তৎকার্য্য ন্যূনাধিক ৫০-৬০ টাকাতেও নির্বাহ হওয়া কঠিন। এক রাত্রির মধ্যে ৫।৬ খান প্রতিমা যাহাদের ধনাপবাদ আছে এমত ব্যক্তিদের গৃহ দ্বারা দিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কেবল কৃপণ ব্যক্তিদের উপরেই এই ভার চাপান যায় এমতও নহে। কখন কখন অতিপরিমিত ব্যয়ি সদ্বিবেচক যিনি স্বীয় ক্ষেত্র বুঝিয়া সাধারণ কর্ম্মে ব্যয় করেন তাদৃশ ব্যক্তির উপরেও কতকগুল পাগল বালকেরা এইরূপ ভার দিয়া ক্লেশ দেয়।" খুব বিশ্বাসযোগ্য সম্ভবপর ঘটনা, কারণ এখনও নববিবাহিত দম্পতির বাড়ির সামনে কার্তিক ফেলার ঘাওরামি বাঙালি ছেলে-ছোকরা চালু রেখেছে।

সে যাই হোক, বাঙালি দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী হলেও মহিষাসুরবধের স্মরণে কিন্তু এই পুজো করা হচ্ছে না, যিনি মহিষাসুরবধ করেছিলেন সেই দেবী কন্যারূপে পিতৃগৃহে আসছেন ছেলেমেয়ে নিয়ে পুজোর ছুটিতে, মায়ের আমাদের নিয়ে মামার বাড়ি যাওয়ার মতো অর্থাৎ মহিষাসুরকে নিয়েও বাঙালির বিশেষ কোনো চাপ নেই সে পুজোও পায়।

বাঙালির গোলমেলে হিন্দুত্বের কারণ ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক, যা-তে বৌদ্ধধর্ম মুখ্য প্রভাবক। যে সামান্য ঐতিহাসিক সময়ে সামান্য কিছুকাল বাঙালি হিন্দু রাজার অধীনে থেকেছে তারাও মুখ্যত ভিনদেশি হিন্দু। তাই বাঙালির ধর্মবোধটাও চিরকাল গোলমেলে। যেমন হালে উদাহরণ দেখা যাবে বিভিন্ন সম্প্রীতি উদ্যানে নজরুল রবীন্দ্রনাথ পাশাপাশি

দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে আমাদের কবি মনীষী এই অর্থে, অনুচ্চারিত থাকে যে নজরুল মুসলমান ও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন। মজার ব্যাপার এটাই যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্ম, আর ব্রাহ্মরা যে হিন্দু নয়, মহাপাতক ধর্মচ্যুত, তাদের ঘরে জল খাওয়া যায় না, বিবাহ তো নৈব নৈব চ, সেকথা বাঙালি বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে। যদিও এসব জানতে বিন্দুমাত্র পড়াশোনা দরকার নেই উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা দেখা আপামর বাঙালির জানবার কথা। খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখলেই এটাকে সচেতনতা বলার বাসনা থাকলে তা রগে উঠে যাবে। তবে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে 'হিন্দু' বলে দাবি করেছেন; কোন অর্থে সেটা গবেষণা সাপেক্ষ।

বাঙালির ধর্মবোধ ও ভক্তির নমুনা তো এখন সর্বত্র জ্বলজ্বল করে, সেকালের কিছু ঘটনা ফিরে দেখা যাক, প্রথম থেকেই দুর্গাপুজো কতটা পুজো আর কতটা আমোদ-প্রমোদ সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। একটিমাত্র বই থেকে পরপর কয়েকটি উদাহরণ দেব, সেটি সুধীরকুমার মিত্র লিখিত *দেবদেবীর কথা ও কাহিনী*।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বঙ্গদেশে হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় সর্বপ্রথম বারো জন বন্ধু মিলে এক পূজা করেন, এটাই বঙ্গের সর্বপ্রথম সর্বজনীন পূজা। বারো জন ব্যক্তি পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন বলেই বারো-ইয়ারি বা বারোয়ারি পূজা বলে খ্যাত হয়। তারপর গুপ্তিপাড়ার পুজো দেখে বল্লভপুর, কোন্নগর, উলা, চাকদা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে জাঁকজমকের সঙ্গে সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। এই পুজোর জন্য

বহু দূর থেকেও চাঁদা সংগ্রহ করা হত এবং পুজোর সমারোহ নিয়ে গুপ্তিপাড়ার সঙ্গে উলা, শান্তিপুরের অধিবাসীদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা হত।

একবার শান্তিপুরের পুজোর জন্য এক বিশাল আকৃতির দশভুজা মূর্তি তৈরি করা হয় এবং সেই প্রতিমার গণেশের পেট তৈরি করার জন্য একটা বিরাট ঢাকাই জালার প্রয়োজন হয়েছিল। গণেশের অনুপাতে দুর্গা কার্তিক লক্ষ্মী মহিষাসুরের মূর্তিও তৈরি হয়। শোনা যায়, ওই প্রতিমার আরতির সময় পুরোহিতকে কপিকলের সাহায্যে উপরে তুলে ধরে আরতি করাতে হয়েছিল। বিসর্জনের সময় মহাসমারোহে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় গাড়ির চাকা মাটিতে বসে যায় এবং অবশেষে প্রতিমাগুলোকে কেটে কেটে পৃথকভাবে বিসর্জন দিতে হয়। উলার বারোয়ারির পাণ্ডাগণ শান্তিপুরের এই ঘটনার পর একটি গণেশ মূর্তি গড়ে তাকে অশৌচের বস্ত্র বা কাছা পরিয়ে শান্তিপুর শহর ঘোরান এবং সর্বসাধারণকে জানালেন, "আমাদের গণেশের মাতার শান্তিপুরে অপমৃত্যু হইয়াছে, আপনারা গণেশকে কিছু ভিক্ষা দান করুন. গণেশ তাহার মাতার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবেন।" উলার ব্রাহ্মণেরা চাঁদা সংগ্রহ করে নির্ধারিত দিনে গণেশকে দিয়ে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন এবং সে উপলক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্রাহ্মণবিদায়ও দেওয়া হয়। (*দেবদেবীর কথা ও কাহিনী*, সুধীরকুমার মিত্র পৃ ১৫৬)

'বারো ইয়ার' থেকে 'বারোয়ারী' শব্দের উৎপত্তির গল্পটা চালু, কিন্তু কৃষ্ণনগরসহ নদিয়ার অন্যান্য প্রাচীন শহরে দেখা যাবে বিভিন্ন পাড়ার মাঝে 'বারোয়ারী থান' গ্রামের 'চণ্ডীমণ্ডপ'-এর মতো, পুজোর ক্ষেত্রে পরিবার-এর বিপরীতে বাইরের

বা সর্বজনের অর্থে শব্দটি 'বার-ওয়াড়ী' হতে পারে, যেমন কৃষ্ণনগরের প্রাচীন 'গোয়াড়ী', হালে প্রচলিত জেলাওয়াড়ি, অঙ্গনওয়াড়ি ইত্যাদি তুলনীয়। ড়, র হয়ে যাওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়, কারণ মনে রাখতে হবে শাহিদুল্লা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ এই তিনটি শহরের অধিবাসীদের কথ্য ভাষাই মান্য বা প্রমিত বাংলা লেখ্য ভাষা। 'মহারাজেন্দ্রবাহাদুর' কৃষ্ণচন্দ্রের প্রোহোৎসাহে বিভিন্ন পাড়ায় এইসব 'বারওয়াড়ী' পুজো চালু হয়েছিল। গ্রাম রেউই, গঞ্জ গোয়াড়ি বাদ দিলেও শুধুমাত্র স্থাপিত 'রাজধানী' শহর হিসাবে কৃষ্ণনগর কলকাতার চেয়ে অন্তত একশো বছরের পুরোনো নগর। কৃষ্ণনগর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামাঙ্কিত নয়, স্বয়ং কৃষ্ণের নামে তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা রাঘব রাজধানী নির্বাচিত করে এই শহরের কৃষ্ণনগর নাম রাখেন। তৎপুত্র মহারাজা রুদ্র রায় ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাদশা 'আলমগীর'-এর কাছ থেকে মহারাজা উপাধি পান এবং বর্তমান রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। কলকাতা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানী হয় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। *ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত*-এ কলকাতায় ইংরেজরা বসতি স্থাপন করার পরেও আলিবর্দি খাঁ-র সময়, ভাগীরথী তীরের অন্যান্য পরগনার সঙ্গে কলকাতাও কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির অন্তর্গত ছিল বলে দাবি করা হয়। রাজপরিবারের জবানিতে 'রাজরাজেশ্বরী'-র পূজা ভবানন্দ মজুমদার-এর সময় (১৬০৩) থেকেই হয়ে আসছে। রাজধানী কৃষ্ণনগরে পূজার প্রামাণ্য সময় ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ ধরা যেতেই পারে। গোয়াড়ি অঞ্চলের গোলাপট্টি বারোয়ারিতে এখনও শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে প্রায় আড়াইশো বছরের পুরোনো

‘মহিষমর্দিনী’ পুজো হয়, যে প্রতিমায় দেবী ও মহিষাসুরের সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ থাকেন না, থাকেন দুই সখী, জয়া-বিজয়া, সেকালের প্রধান বাণিজ্য পথ অর্থাৎ নদীপথে ভরা-বর্ষায় নৌকাডুবি না-হওয়ার কামনায় এই পুজো খুব জাঁকজমক করে হত। কালনাতেও এই পুজো চালু আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কলকাতার প্রথম বারোয়ারি বা সর্বজনীন পুজো হয় সবে মাত্তর ১৯২৩-এ, সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে, মতান্তরে ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাটে ‘সনাতন ধর্মোৎসাহিনীসভা’-য় ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে। তার আগে যত কলকাতার বাঙালির পুজোর গল্প সবই পারিবারিক, সে তো এক কথায় অসাধারণ ধর্মাচরণের নমুনা। যার তুলনা কোথ্থাও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। সে ইতিহাসের আলোচনা পুরোনো কলকাতার কথা উঠলেই আলোচিত হয়। ১২৩৬ সালের ২ কার্তিক ‘সমাচার দর্পণ’ লিখছে, “সমারোহপূর্ব্বক এই উৎসবকরণ অল্পকাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ২ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনাদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধনসম্পত্তি দর্শাইতে পূর্ব্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।” পরিষ্কার বোঝা যায় দুর্গাপুজোটাও বাঙালির ইতিহাসে আমাদের কৃষ্ণনগর নদীয়ার অবদান। যা দেখেশুনে কলকাতার জাঁকজমক, বাইজি নাচ-গান, গাঁজা-গুলি-মদ-মাংসের ফোয়ারা, সাহেব-সুবোদের নেমন্তন্ন করে নরক গুলজার, আর তাই নিয়ে বাবুতে বাবুতে রেষারেষির ইতিহাস।

ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সাহেবদের নেটিভবাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হওয়া একেবারে পছন্দ করতেন না। 'ক্যালকাটা গেজেট' (৯. ১০. ১৮২৬) লেখেন—"দুর্গাপূজার সময় মুসলমান বাইজী দিয়ে নাচ-গান ও ইংরেজ অতিথিদের তোষণের অত্যধিক আগ্রহ গোমাংস ও বিয়ার খাওয়ানো দেবী দুর্গার অর্চনার সঙ্গে একেবারে মিলনক্ষম নয়, বরং পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়।" (*দেবদেবীর কথা ও কাহিনী*, সুধীরকুমার মিত্র, পৃ ১৭৩)

আসলে ইংরেজ লেখকেরা বুঝতেই পারেননি, আমাদের আলোচ্য দেবী শাস্ত্রমতেই মদ্য-মাংস প্রিয়া। আর ইন্দ্রাদিকে ডেকে যজ্ঞ-ভাগ মদ মাংস খাওয়ানো, আশীর্বাদ হিসাবে 'এই দাও' 'ওই দাও' তো সাক্ষাৎ বেদ অনুসারী, ঋকবেদের গোটা নবম মণ্ডল সাক্ষী। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও দেবী ঢকঢক করে মদ গিলছিলেন, সেকথা চণ্ডীপাঠে এখনও বলা হয়—

"ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্ পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা।।

[...] মদোদ্ধূতমুখরাগাকুল্। গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম"

নাগোজীভট্টের টীকা আছে, মহিষের শিবাবতারত্বহেতু জায়মান দয়াবিচ্ছেদের জন্য দেবীর মদ্যপান!

শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস নামক এক ইংরেজ মহিলা তাঁর স্মৃতিকথায় (অক্টোবর ১৮২৩) দুর্গাপুজোর নিমন্ত্রণের অভিজ্ঞতা লেখেন, "পূজা মণ্ডপের পাশের একটি বড় ঘরে নানা রকমের সব খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর

ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশী পরিবেশক 'মেসার্স গান্টার অ্যাণ্ড হুপার' সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও ফরাসী মদও ছিল প্রচুর। মণ্ডপের অন্য দিকে বড় একটি হলঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাইজীদের নাচ-গান হচ্ছিল এবং ইউরোপীয় ও এদেশী ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে, চেয়ারে বসে সুরা সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। বাইরেও বহু সাধারণ লোকের ভিড় হয়েছিল বাইজীদের গান শোনার জন্য। গানের হিন্দুস্থানী সুর সমাগত লোকজনদের আনন্দে মাতিয়ে তুলেছিল।" (সুতানুটি সমাচার)

গত কয়েকবছর ধরে মহরম আর দুর্গাপুজোর ভাসান একই দিনে হওয়া নিয়ে গোলমাল পাকানোর অনেক রাজনৈতিক ফিকিরের সাক্ষী আমরা, কিন্তু মুসলমান বাইজিদের না-পেলে কলকাতার দুগ্গাপুজোর ফুত্তি এককালে পুরো ঝুলে যেত। ১১২৭ সালে দুর্গাপূজার সময় মুসলমানদের মহরম পড়েছিল বলে কোনো বাইজি উৎসবে যোগদান করেননি। 'সমাচার দর্পণ'-এ (২১ অক্টোবর ১৮২০) প্রকাশিত হয়েছিল, "দুর্গোৎসব।। এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারও বাড়িতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেদের মহরম প্রযুক্ত বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই!"

বাঙালির দুর্গাপুজো শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ধর্ম ছাপিয়ে, উৎসব, আমোদ, কার্নিভাল। সেখানে যোগদানের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম বিভাজন কখনই ছিল না, আজও নেই। পৃথিবীতে কোনো দেশের কোনো ভাষায় নজির নেই একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর হাজার হাজার পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র একসঙ্গে

তাদের শারদীয় উৎসব সংখ্যা বের করে পাঠককে সাহিত্যের মহাভোজে আমন্ত্রণ করে! যাবতীয় বেলেল্লাপনা সহযোগে এটিও একান্তভাবে বাঙালি কালচারের অন্তর্ভুক্ত।

এই বাঙালির পূর্বপুরুষ মুসলমান শাসনে বসবাসকারী কৃত্তিবাস ওঝা কেন বাংলা রামায়ণ-এ তথাকথিত বিষ্ণু-অবতার রামের মহিষাসুরমর্দিনীর অকাল-বোধনের কাহিনি অন্তর্গত করতে গেলেন কেনই-বা শৈব ব্রাহ্মণ রাবণকে দিয়ে অম্বিকা আরাধনা করালেন কে জানে! তার কারণ অনুসন্ধানে অনুমান-প্রমাণ পন্থা নিতে হবে, প্রথমত রাবণের প্রতি দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক কৃষ্টি কুলাচারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বঙ্গজনের স্বভাবজ সহমর্মিতা ('ঘরশত্রু বিভীষণ', 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ', এসব প্রবচনের নিহিতার্থ বিশ্লেষণ করলে যা দেখা যায়। ছোটোবেলায় দু-কানে আঙুল দিয়ে রাবণের জ্বলন্ত চিতার শব্দ শোনেনি এমন বাঙালি বিরল)। দ্বিতীয়ত বীর রাজা রাবণ কিছু ব্রাহ্মণাচরণ পালন করা সত্ত্বেও ভয়ানক অপরাধ থেকে বিরত হচ্ছেন না, তাঁর নিজস্ব নীতিবোধ ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব হতে বিচ্যুত করছে কবিমানসের এমত ব্যক্তিগত ধারণা। সূর্পনখার সঙ্গে রামলক্ষ্মণের বাজে খিল্লি ও তারপর অপ্রয়োজনীয় মাত্রাতিরিক্ত সহিংস ব্যবহার বাল্মীকি লিখিত, কৃত্তিবাস সেটি বদলাননি, রাজার ভগিনীর প্রতি দুই অনুপ্রবেশকারীর এই অন্যায় আচরণ রাজা যদি তাঁর রাজত্বে বরদাস্ত করেন তাহলে আর যাই হোক রাজত্ব রক্ষা করা যায় না, রাবণ কেন সীতাহরণ করেন বা আদৌ করেছিলেন কিনা (*ছায়াসীতা দ্র*) সে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ, হরণের পর যে কারণেই হোক কোনো অসৎ ব্যবহার করেননি।

উত্তর ভারতীয় বা আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণকারী অধিকাংশ বাঙালি, বৈদিক যজ্ঞ ছেড়ে পুজো-পাঠরত বাঙালি বামুন, আরাধনা অঞ্জলিতে বিশ্বাসী বাঙালি, শৈব-শাক্ত সাধক তান্ত্রিক বাঙালি, তান্ত্রিক বৌদ্ধ বনে যাওয়া বাঙালি, বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত 'নেড়ে' মুসলমান, হিন্দু অন্ত্যজ জাতি থেকে ধর্মান্তরিত 'খড়ে' মুসলমান বাঙালি, পাঠান রাজত্বে স্বস্তিতে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালি, যারা উত্তর ভারতীয় হিন্দু রাজাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পাঠান গৌড়েশ্বরদের সহায়তা করেন, পীরকে সত্যনারায়ণ বানিয়ে দেওয়া বাঙালির প্রতিভূ হিসেবে কৃত্তিবাস ওঝা রাবণের এই রাম-ভক্তির আখ্যান আপন কর্তব্যবোধে বাংলা রামায়ণ-এ অন্তর্ভুক্ত করেন। আর একটা অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে, পাঠান আমলে বাংলার সম্পদ বাংলাতেই থাকত, মোগল আমলের মতো দিল্লিতে বা ইংরেজ আমলের মতো ইংলন্ডে চলে যেত না, এছাড়া পাঠান রাজারা প্রায় বাঙালি হয়ে গেছিলেন, তাঁরা সাহিত্য সংস্কৃতিতে উৎসাহ দান করতেন। এই সময়ে অজস্র নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেন তা মূলত জাতিভেদের বামনাই সামাজিক অত্যাচারে, পাঠান অত্যাচার বা জোর করে ধর্মান্তরিতকরণ তার চেয়ে ঢের কম ছিল। এখন সে ইতিহাসকে ধামাচাপা দেবার, মিথ্যাকে সত্য বলে চালাবার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, যা ঊনবিংশ শতকেও ঘটেছে। কিন্তু সে সমস্তের বিপরীতে একা শ্রীচৈতন্যের জীবন কাহিনি যথেষ্ট। কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ব মানুষ তাঁর রামভক্তি ও বাল্মীকি থেকে বিচ্যুতিতে সামান্য হলেও মুসলমানি প্রভাব আছে, বৈরিতা নেই। সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে কৃত্তিবাসের

জন্ম ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী রবিবার ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৬-এর মাঝে কৃত্তিবাস রুকনুদ্দিন বারবক শাহ-র সভায় যান (ভারবি প্রকাশিত *কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ*, ভূমিকা) কৃত্তিবাসের রামায়ণ মোটামুটি দ্রাবিড় ভক্তিবাদী বৈষ্ণব (আলওয়ার) ভাবধারায় বিরচিত। যে বামুনেরা কৃত্তিবাস কাশীরামকে দেবভাষা হতে রামায়ণ মহাভারত-এর বাংলা অনুবাদের পাপে রৌরব নরকে স্থান নির্দেশ করেছিলেন, তাদের পক্ষাবলম্বন নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। ধর্মীয় ধারণায় এই বহিরাগত বামনাই মনোভাব বোঝা যাবে অনেক পরে ব্রিটিশের আর্য আক্রমণ তত্ত্বে বাঙালি বিদ্বানদের অতিউৎসাহী সহযোগে।

অষ্টাদশ পুরানাণি রামস্য চরিতানি
ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।

পরবর্তী কালে,

কৃত্তিবেশে কাশীদেসে আর বামুনঘেঁষে
এই তিন সর্বনেশে।

'ক্যালকাটা রিভিউ', ভল্যুম ১৩, (জানুয়ারি-জুন ১৮৫০) পৃ ৪৮-এ দেখা যাবে বাঙলা রামায়ণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে—"Its stories are more offensive, its language more indecent, than in the original; and the whole is tainted with an air off downright vulgarity, which would have made Valmiki turn aside in disgust."

১৮৮১ নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের এক পণ্ডিত "জয়গোপাল তর্কালংকার কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত-এর উপর কলম চালিয়ে,

তাদের থেকে 'অশ্লীল' কথা বাদ দিয়ে তাদের বিশুদ্ধ সংস্করণ বার করেছিলেন।" (সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, ২০১৩, অনুস্টুপ, পৃ ২৭২)

লক্ষণীয় বিষয়টি হল, বাংলা রামায়ণ মহাভারত অধিকাংশ মঙ্গলকাব্য পাঠান রাজাদের ছত্রছায়ায় বসে লেখা হচ্ছে। কেন? মছলিখোর বাঙালির বাসস্থান বঙ্গদেশ, যেখানে পা রাখলেই আর্যাবর্তবাসীদের জাত যায় পৌরাণিক সময় থেকে, তারা তো আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অগ্রসর করতে চাইতে পারে না, করেওনি।

বাঙালি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ করে সমগ্র নদিয়াবাসী আজও একটি শব্দ অসচেতনে অনর্গল উচ্চারণ করে, 'ন্যাকা চৈতন্য', কেন-না বিষ্ণুর দশ অবতারের প্রায় সকলেই এসেছেন যুদ্ধে ত্রিভুবনেশ্বর শৈব রাজাদের বা তথাকথিত দৈত্য রাক্ষস যাদের প্রতাপে দেবতারা স্বর্গের আধিপত্য হারিয়েছেন, তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করতে এবং যা-তে বল-এর সঙ্গে সঙ্গে ছলনা ও কৌশল ব্যাপক ব্যবহৃত, কোনো অবতারত্ব সেখানে কাজ করেনি। পুরাণকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে, বৈষ্ণব শৈব গাণপত্য সৌর এবং শাক্ত, বিষ্ণুপুরাণের সবই যুদ্ধকাহিনি, আমাদের দুই মহাকাব্যের নায়করা বিষ্ণুর অবতার। যে কৃষ্ণ সমগ্র ভারতকে প্রায় পুরুষশূন্য করে তুললেন ধর্মযুদ্ধের নামে সেই কৃষ্ণকে বংশীধারী প্রেমের রাজা গোবিন্দ সাজিয়ে, যাঁকে পূজা করলেই নাকি সব দেবতার আরাধনা হয়ে যাবে, প্রচারকারী কিনা দুর্দান্ত নিমাই! যার পূর্বাশ্রমে পড়াশোনার খ্যাতি ছিল মুখ্য, ক্ষুরধার তার্কিক, তাঁর এই মতপ্রচার! তা-ও আবার

পাক্কা এযুগের মিছিলের ধাঁচে, কাজী-র বাড়ি ঘেরাও করে, যবন শিষ্য নিয়ে, মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না মার্কা স্টাইল, পরবর্তীকালের বাঙালি কৃষ্ণনাগরিকের কাছে ন্যাকা-চৈতন্যপনা মনে হওয়া স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা মানবিক নব বৈষ্ণব ধারার প্রবর্তককে খুন করা হয় পুরীর মন্দিরে, তিনি মারা যেতেই বামুন বৈষ্ণবেরা নিজেদের জাত্যভিমান তুঙ্গে তুলে ধরেন, বাকিরা হয়ে যায় স্রেফ বোস্টম। কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার বামুন, তাঁরা চৈতন্যকে অবতার বলে স্বীকার করেননি, এই রাজপরিবারের ভবানন্দ মজুমদার রাজা হয়েছিলেন জাহাঙ্গিরের সেনাপতি মানসিংহকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা ও সৈন্যসংগ্রহ করে দিয়ে। (যদিও 'প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম খাঁর আমলে প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটেছিল'— যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নদীয়া*, পৃ ২০) তিনি মোটামুটি ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা উপাধি ও নদিয়াসহ ১৪টি পরগনার জমিদারি পান। তাঁরা নাকি ভট্টনারায়ণের বংশধর। কনৌজাগত পাঁচঘর বামুনের এক বামুন, যিনি নাকি প্রভূত ধন-সম্পত্তি সঙ্গে করে এনেছিলেন! যাঁর ষোলো পুত্রের একজন বরাহ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, যিনি *বেণীসংহার* কাব্য লেখেন আর একজন নিপু, যিনি এই বংশের পূর্বপুরুষ। তাঁরা বৈষ্ণব, তাই সুযোগ্য উত্তরসূরি বাংলা সংস্কৃতিতে প্রায় বিক্রমাদিত্যের মতো যশস্বী কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যিনি প্রামাণ্যভাবে দুর্গাপূজাকে বাঙালির প্রধান ইভেন্ট বানাবার হোতা, তাঁদের প্রাসাদের প্রতিমা 'রাজরাজেশ্বরী'-র বাহনের মুখ সিংহের নয়, ঘোড়ার বা ঘোটকের। কারণ সিংহ অর্থাৎ হিংস্র, তাঁরা অহিংসাবাদী

বৈষ্ণব!! ধর্মবিশ্বাস জিনিসটা এতই গোলমেলে আর অযৌক্তিক যে, কোনো কথা আলোচনা করলেই একদল লোকের বিশ্বাসে আঘাত লাগে, আর যেটা নাকি কোনো ভদ্র শিক্ষিত মানুষের ভারতীয় সংবিধান অনুসারে একদম করা উচিত নয়।

কিন্তু কী করা যাবে এই যে 'ভদ্র' শব্দটা লিখলাম, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান খুলে দেখুন, আপনার জানা অর্থগুলির পর মনুসংহিতাকে দ্রষ্টব্য করে হরিচরণ লিখছেন, 'কল্যাণাচারে যাহার পাপ প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ যে গোপনে পাপ করে ও বাহিরে সদাচারে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পরধন গ্রহণ করে, তাদৃশ ব্যক্তি'। এর বাস্তব প্রয়োগ একমাত্র শুনতে পাবেন ডোমেস্টিক হেলপ-এর "ভদ্দরনোক! হুঁহ", বাক্যে। হরিচরণ 'মহিষাসুর' শব্দের অর্থে কোনো জটিলতায় যাননি, শুধু লিখেছেন, 'মহিষ নামক অসুর'। এইসূত্রে এবার মহিষাসুরের খোঁজে এক আজব অভিধান অভিযানে যাওয়া যাক, কলিম খান রবি চক্রবর্তীর *বাংলা শব্দার্থকোষ*, বাংলা ভাষার 'ক্রিয়াভিত্তিক - বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান', যাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় সেই কোন কালে 'অপর' পত্রিকার সৌজন্যে। ওই অভিধানে মহিষাসুর এন্ট্রির সামান্য অংশ তুলে দিলাম— "শব্দের ভিতরে যথার্থ ইতিহাসের পদচিহ্ন থাকে। সেই পদচিহ্ন দেখতে পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় এবং সেই পদচিহ্ন ধরে ধরে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তাহলেই বহু অজানা ইতিহাসও ক্রমে চোখের সামনে দৃশ্য হতে থাকে। সেই যোগ্যতার অতি সামান্য আমাদের কপালে এখন পর্যন্ত জুটেছে। আমরা যেটুকু বুঝেছি, সেটুকু অতি সংক্ষেপে বলি। ব্যাপারটি এইরূপ—বৈদিক-পূর্ব্ববর্তী মহান যুগ

বা সনাতন যুগটি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সেখানে দু-ধরনের পুরুষ ও নারী ছিলেন— **মহিষ** ও **মহিষী** এবং **মহিল** ও **মহিলা**। সমাজের পরিচালিকা নারীদের বলা হত মহিষী এবং তাদের সহযোগী নরদের বলা হত মহিষ আর সাধারণ অনুগামী নারীদের বলা হত মহিলা এবং তাদের সহযোগী নরদের বলা হত মহিল। এই মহিলা ও মহিলদের সংখ্যাই ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। মহিষীদের সহযোগী নরদের স্বভাব ছিল মহিষ বা 'কাঁড়া'র মতো, সমাজ পরিচালনার বোঝা বইতেন এঁরাই, এঁরাই ছিলেন মানবজাতির আদি নেতা, এঁরাই ধর্ম্ম (সামাজিক রীতিনীতি) সৃষ্টি করতেন এবং সেই ধর্ম্ম রক্ষা করতেন এঁরাই, এঁরাই ছিলেন আদি শিব, সনাতন শিব, মহান-শিব। বৈদিক যুগের সূচনার পরে ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব চলে যায় যমের (= বিচারালয়ের) হাতে। স্বভাবতই তার বাহন হয়ে যায় মহিষ বা দেশনেতাগণ, যাঁরা জলে (জনগণের ভিতরে ও জনসমর্থনের ভিতরে) ডুবে থাকেন, জলকে আন্দোলিত করেন, জনগণকে নিয়ে আন্দোলন করেন এবং জলে (জনসমর্থনের ভিতরে) ডুবে না-থাকলে এদের শরীর গরম হয়ে যায়, মাথা গরম হয়ে যায়। এরাই লোকসভা-বিধানসভায় গিয়ে আইন বা ধর্ম্ম সৃষ্টি করেন, সবাই যাতে সেই ধর্ম্ম পালন করে, সেদিকে নজর রাখেন। আর, সনাতন-শিব যতিধর্ম্ম গ্রহণ করে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ থেকে সরে দাঁড়ান, তার বাহন বৃষ বা ষাঁড় মালিকহীন হয়ে বনে-বাদাড়ে মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক এই অভিধানে বিষ্ণু অর্থ ক্যাপিটালিস্ট বাণিজ্যবাদী। স্মর্তব্য ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডে মার্কসের বাক্যটি— "Enough, that the world still jogs on,

solely through the self-chastisement of this modern penitent of Vishnu, the capitalist."

বিভিন্ন পুরাণ পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই, যে অসুর স্বর্গরাজ্য দখল করেননি, পৌরাণিক ইতিহাসে তাঁর নাম নেই, তাঁদের অত্যাচারের কথার কোনো উল্লেখও পুরাণে নেই। সাধারণত একটা কারণেই অসুরেরা নিন্দিত হয়েছেন— স্বর্গ রাজ্যে হানা দেওয়া। সে নিন্দাও প্রায় একই রকম, তাদের অত্যাচারে ত্রিভুবন অতিষ্ঠ, দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত, ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ নাশ, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের যজ্ঞের ভাগ যেহেতু দেবতারা পেতেন, তাই দেবতারা স্বর্গচ্যুত হলে ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নাশ হত। এর মধ্যে কোনোটা অত্যাচার হতে পারে না। দেবতাদের দলবদ্ধ হয়ে বিষ্ণুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে যাওয়ার জন্য এটা বানানো ছুতো। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব, এই তিনজন দেবাসুরের বিবাদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। অসুরেরা তপস্যায় এঁদের তুষ্ট করে বর লাভ করতেন এবং স্বর্গ থেকে বাহুবলে দেবতাদের বিতাড়িত করতেন। তারপর দেবতারা নিজেদের বাহুবলে নয়, পৃথিবীর পালনকর্তা বিষ্ণুর সাহায্যে কৌশলে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতেন। পিতামহ ব্রহ্মাকে দেবতারা বোঝাতেন যে অসুররা বড়ো অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, আর দেরি করলে সৃষ্টি রসাতলে যাবে, ব্রহ্মা তখন দেবতাদের বিষ্ণুর কাছে নিয়ে যেতেন। বেদ ও পুরাণের অসুরেরা ধর্মবিদ্বেষী বা অত্যাচারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন, কিন্তু এঁরা বলবীর্যবান, সচ্চরিত্র, সরল বিশ্বাসী, তপস্বী, সাধনায় সিদ্ধিলাভকারী। ছলনা বঞ্চনা তাঁরা ঘৃণা করেছেন, বিপদ বরণ করেছেন দলবদ্ধ হয়ে। তারপর দেবতা ও মানুষের সঙ্গে

নিরন্তর সংঘর্ষে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছেন। আজ যাঁদের নাম বেঁচে আছে সেই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মিথ্যা নিন্দা। সুবোধকুমার চক্রবর্তী *শাশ্বত ভারত:অসুরের কথা*-য় লেখেন, "যে যুগে দেবতায় ও অসুরে কোন প্রভেদ ছিল না, সে যুগ গত হয়ে গেছে। সত্য যুগের অসুরদেরও আমরা নিন্দা করতে পারি না। তাদের ধর্ম ছিল, ধর্ম জ্ঞান ছিল গভীর। শিবের তপস্যার কথা জানি, ব্রহ্মাও তপস্যা করতেন। কিন্তু সাধারণ দেবতাকে তপস্যা করতে দেখিনি, তারা মানুষের যজ্ঞে হবির ভাগ নিতে আসতেন। কিন্তু তপস্যা করেছে অসুরেরা, দৈত্য দানব রাক্ষসেরাও তপস্যায় বল সঞ্চয় করেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কৃপা লাভের যোগ্যতা লাভ করেছে কঠোর তপস্যায়। এদের আমরা নিন্দা করতে পারি না। এরা শক্তিতে স্মরণীয়, ভক্তিতে বরণীয়, নমস্য এরা। তারপর এক দিন রাক্ষস নামের সঙ্গে নিন্দা জড়িয়ে গেল। কোন গুরুতর কারণের জন্য যে নয় তাতে সন্দেহ নেই। পুরাণকারদের সক্রিয় চেষ্টাতেও যাঁরা নিন্দার পাত্র হননি, তারা সাধারণ মানুষের কাছে ধীরে ধীরে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে গেলেন। কী করেছিলেন রাক্ষসেরা! ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট! দেবতারা করেননি! দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যাচারে কি ঋষিরা কখনও নির্বিঘ্নে তপস্যা করতে পেরেছেন! রাক্ষসেরা রক্ত মাংস ছিটিয়েছেন যজ্ঞ স্থলে, আর দেবরাজ অপ্সরা পাঠিয়েছেন ঋষির তপোভঙ্গের জন্য। ছলনা বঞ্চনা চরিত্রহীনতায় অসুরেরা দেবতাদের মতো পারদর্শী ছিলেন না। তবু আজ দেবতারা আমাদের পূজ্য, আর অসুররা হয়েছেন নিন্দার পাত্র"। (পৃ ১৩২)

শেষকথা

শুরুতেই অসুর উৎসব নিয়ে এত কথা বলবার কারণ যাঁরা এই উৎসব সংগঠিত করছেন তাঁরা তাদের রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই করছেন সেই অবস্থানের ভুলত্রুটিবিচার আমার কাজ নয়, কিন্তু ২০১৭-এর একটি মামলা যেটি আবার নতুন করে সংবাদমাধ্যমে ফিরে এসেছিল, *ওয়ার এন্ড পিস* নামক বইটির সম্পর্কে মাননীয় বিচারপতির করা মন্তব্যের কারণে, সেই মামলার অভিযুক্ত ভেরনান গঞ্জালেস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে তপশিলি জাতিভুক্ত 'মাহার' সৈন্যদের বামুন পেশোয়াদের বিরুদ্ধে ভীমা-কোরেগাঁও-এর যুদ্ধে জয়লাভের দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দাঙ্গা এবং মৃত্যুর ঘটনায় উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেওয়া। দলিত জাতের উপর ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার অবিসংবাদী যা আজও ভারতের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন মব লিঞ্চিং-এর ঘটনায় বারংবার সামনে আসছে। কিন্তু যেহেতু 'মাহার'-রা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ছিল তাই তারা দেশদ্রোহী আর পেশোয়ারা বামুন বলে মহান দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গল্পের অংশ হয়ে যান। বর্তমানে উভয় পক্ষীয় রাজনীতি কিন্তু একই উদ্দেশ্য মূলক অবস্থান থেকে সংগঠিত, 'লোক খ্যাপানো', 'রাজনীতি করা' এবং 'প্রোগ্রাম নেওয়া' (অতীতে এই দল-দুটির পূর্বপুরুষেরা সরাসরি ওই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন সেকথা বাদ দিলেও)। তাই অসুর উৎসব যে-কোনো মুহূর্তে 'হিন্দু বিরোধী', 'আমাদের ঘরের মেয়ে উমার সম্মান নিয়ে টানাটানি' হিসাবে দাঁড়

করানো হতে পারে। সাধারণ হেঁদু বাঙালি কোন পক্ষের কিছুই না জেনে-বুঝে পক্ষাবলম্বন করে ফেলবে। **বাঙালি বামুনদের যদি দলিত শবর-পুলিন্দ-অভিপূজিতা দুর্গাকে নিয়ে যা খুশি তাই অং-বং-চং স্তুতি করে, অসুরদের শয়তান প্রতিপন্ন করে, পুজো সৃষ্টি করে জাতীয় উৎসব বানিয়ে তুলবার অধিকার থাকে, তাহলে অসুর উপজাতি বা অন্যান্য মূলনিবাসীদের-ও সেই গণতান্ত্রিক অধিকার আছে এবং সে অধিকার সাংবিধানিক অধিকার (নিজ ধর্মাচরণের স্বাধীনতা) সেটা সকলকে মেনে নিতে হবে।** আমার একটা পাতি বিশ্বাসে আঘাত লাগল বলে মারমুখী হয়ে উঠলাম অথচ অন্যের বেলায় কথায় কাজে সে খেয়াল রাখি না, এটা শিক্ষা নয় বিশেষত যেখানে ভারতবর্ষের হিন্দুগিরি অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে, বাঙালির হিন্দুগিরি হিন্দুস্থানিরা কোনোদিন মানেনি, আজও মানবে না, নিম্নশ্রেণির পাখপাখালি অপবিত্র প্রাণী বলে ভাবত বেদের সময়, আজও সেরকমই ভাবে শুধু আমাদের অন্তর্লীন অশিক্ষাকে উসকে 'গুজ্জু' স্বার্থ-পূরণ হবে। যেমন গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ কৃষ্ণনগর শহরের উপকণ্ঠে হঠাৎ করে বলরামপুজো চালু করা হল, ফেসবুকে উদ্যোক্তা একজনের পোশাক ও বাতেলা শুনে বুঝলাম তিনি সংঘের কেউ, কৃষকদের সম্মান জানাতে নাকি এই পুজো হচ্ছে! ওদিকে গুজরাত রাজস্থানের বলভদ্র পূজা যা তাঁর জন্মতিথিতে হয়, সেটি পেরিয়ে গেছে মাসখানেক আগেই! কেষ্টার শহরে রাম তেমন কল্কে পাচ্ছে না হয়তো, তাই দাদা বলরাম, এক ঢিলে দুই পাখি, এক দিকে 'বলো রাম', অন্যদিকে বলরাম তো সর্বদা 'মাতাল' দেবতা। এই রাস্তার ধারে চুলকানির ওষুধ কিংবা মাদুলি বেচতে

মজমায় ভূত-পিশাচ নামানোর মতো রাজনীতি করতে হলে দেবতা নামানো আদি ভারতীয় ঐতিহ্য, অন্তত ইতিহাস সেকথাই বলে। তাই বর্তমানের এসব ইতিহাস পরিচ্ছন্নভাবে উল্লিখিত থাকা প্রয়োজন।

একটা কথা বাঙালিকে খুব পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে, আমরা ভারতবাসী, আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ—হিন্দুস্তান নয়, আমরা 'হিন্দুস্থানি' নই। হিন্দুস্থানি একটি উত্তর-ভারতীয় ভাষা বা ভাষাগোষ্ঠী, চিরকাল আমাদের কথোপকথনে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, এখনো হয়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, বিভাষায় 'হিন্দ' কিংবা 'ইন্দ' থেকে ইন্ডিয়া, কিন্তু পাকিস্তান-এর বিপরীত, এই অর্থ-প্রযুক্ত হিন্দুস্তান নয়। আমাদের দেশপ্রেম ভারতবর্ষের প্রতি (প্রাচীন ও আধুনিক) হওয়াই বাঞ্ছনীয়, হিন্দুস্থান নামক হিন্দি ভাষাভিত্তিক বা শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের বাসস্থান হিন্দুস্থানের প্রতি নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো দেখে আর প্রোপাগান্ডা পড়ে যেসব বাঙালি হঠাৎ মহাজ্ঞানী হিন্দু দেশপ্রেমিক হয়ে উঠেছে তাদের নিরস্ত করা এখনো যারা বইপত্র ও পত্র-পত্রিকা পড়েন তাঁদেরই কর্তব্য। আমাদের ভারতবর্ষীয় সভ্যতা অজস্র জাতি আর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমাহার। লক্ষ লক্ষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিদেশিদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুকরণ করে একই 'হিন্দু' নামে ডেকে নোংরা রাজনীতি বন্ধ হোক। আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ প্রচুর শাস্ত্রীয় বাকবিতণ্ডা হাজার হাজার বছর ধরে করে আসছি, করব—একে অপরের চেয়ে উন্নত প্রমাণ করার জন্য হাস্যরসাত্মক তার্কিক প্রকাশ চালু রাখব। কিন্তু সেইসব জয়ী-পরাজিত-বিজয়ী-বিজিত একসঙ্গে সম্মিলিতভাবে

ভারতবাসী হয়ে থাকব, সেটাই আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সংবিধানের ফেডারাল স্ট্রাকচার। নব্য হিন্দু দেশপ্রেমিক দাঙ্গাবাজরা হয়তো ভুলে যান ভারতীয় সভ্যতার পুরাতনত্ব যে সিন্ধু-নগরীগুলি দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত হয়, সেগুলির অধিকাংশ পাকিস্তানে ও আফগানিস্তানে অবস্থিত। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নোংরা রাজনৈতিক প্রচারে অন্ধভাবে সেই রাষ্ট্রগুলিকে বাচিক আক্রমণে নীচু দেখানোর প্রচেষ্টা বা শূন্যগর্ভ পরমাণু বোমার ভয় দেখানোর একটাই অর্থ এই সভ্যতার আদি ভূখণ্ড বা দেশকে অপমান, সেটা দেশপ্রেম তো নয়ই, ঐতিহাসিক দেশদ্রোহিতা। এই দেশদ্রোহীদের শিক্ষার প্রয়োজন, যে-শিক্ষা শিক্ষকের ছড়ির-ঘা-সহ ঘটতে পারে, একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির ন্যাকামো দিয়ে নয়। সেই আধুনিক ন্যাকামির ফসল হল এই বৈজেপিক দেশপ্রেম। হ্যাঁ ফসল, আগাছা নয়। এটা যত দ্রুত তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক বিজ্ঞানপন্থী, বাজার অর্থনীতি বাহিত আধুনিক ঔপনিবেশিকতার দাস, মুখেন মারিতং জগৎ, ফেসবুকিয়া বিরোধী বুদ্ধিজীবীরা বুঝবেন ততই মঙ্গল। বেদ উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস কিছুই না-বুঝে, না-জেনে, ‘ধর্ম হল আফিম মার্কা’ হিন্দুত্ববাদের সমালোচনায় কার্যকরী কিছুই সম্ভব নয়, চাড্ডি-মাকু-ছাগু ইত্যাদি বিশেষণে পারস্পরিক খিস্তিবাজিতে ধর্মবিদ্বেষে ইন্ধন জোগানো ছাড়া। পৃথিবীকে বদলাবার চেষ্টা করতে গেলে আগে তাকে বুঝতে হবে উনিশ-বিশ শতকি নির্বোধের মতো স্লোগানবাজিতে কাজ হবে না। অপরপক্ষীয় বা বর্তমানের ক্ষমতাসীনদের, নীচতা-ছলনা-কাপট্য অবিকল দেবতাদের ক্ষমতা ধরে রাখবার চক্রান্তের মতোই তার

ফলে সাময়িক সাফল্য আসতেই পারে, কিন্তু সেই গল্প ছলনা কাপট্য হিসেবেই রয়ে যাবে সনাতন ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ মানুষের কালেক্টিভ আনকনসাসে এবং তার প্রয়োগ ঘটবে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পুরাকাহিনি বিশ্লেষণের নবতর তত্ত্বের আলোকে। এমনকি এঁদের গুরুদেব সাভারকার পরিষ্কারভাবে হিন্দুত্ব ও হিন্দু ধর্মের ফারাক বুঝিয়ে গেছেন লিখিতভাবে, হিন্দুত্বকে তিনি বলেছেন (not Hinduism–Hinduness) কালচার বা কুলাচার বা সভ্যতা এবং তিনি ভারতীয় সভ্যতার উৎস সিন্ধু সভ্যতা ধরেই হিন্দু সভ্যতায় উপনীত হন, অতএব সাধু সাবধান। বাঙালি হিন্দু, সাধারণ ধর্ম বা ঠাকুর-দেবতা বিশ্বাসী তথাকথিত সাধারণমানুষ, যাঁরা আছেন তাঁদের মানতে হবে **ভদ্রকালীর আশীর্বাদে মহিষাসুর আমাদের পূজনীয়। যতদিন মহিষাসুরমর্দিনী পুজো থাকবে ততদিন তাঁর পূজা থাকবে। আপনি যখন মূর্তিকে প্রণাম করেন, মহিষাসুরকেও করেন দেবীর আদেশে।** সনাতন ধর্মের মধ্যে ভালো/মন্দ, আলো/কালো, ঈশ্বর/শয়তান এই বাইনারি অপোজিট, একপেশেমির কোনো জায়গা নেই। আমরা মহিষাসুরকে প্রণাম করি, 'দসেরা'য় রাবণ পোড়ানো আমাদের আচার নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এ রাবণ রামের ভক্ত শুধু নন, যুদ্ধ পর্যন্ত করতে চাননি। শেষ যুদ্ধে যখন রাম মৃত্যুবাণ প্রয়োগ করতে যাবেন, তখন নিজ ভক্তরূপ রাম সমক্ষে প্রকাশ করে সীতাকে ফেরত দিতে সম্মত হন। দেবতাদের চক্রান্তকে শেষ রূপ দিতে পবন উন্মাদ-বায়ু হিসেবে তাঁর উদরে প্রবেশ করেন, ফলে আবার ঘুরে রামকে গালাগালি দিতে দিতে ফিরে আসেন। "আজি যদি রাবণ রাজা না

হইল সংহার। কোটি রাম কালি কি করিবে উহার।। রামের ঠাঁঞি রাবণের রহিলো জীবন। স্বর্গবাসে থাকিতে নারিবে দেবগন।। সীতা আনিতে যায় রাজা লঙ্কার ভিতর। উন্মাদ বায়ু যাহ রাবণের উদর।। ফিরিয়া রামেরে তবে ভর্ৎসুক রাবণ। তবে সে লইবে রাম তাহার জীবন।।" যারা আজও রাবণ পোড়ায়, তারাই মডার্নিস্ট-ফ্যাসিস্ট কায়দায় সেই ধর্মকে ব্যবহার করে 'দ্য বানালিটি অভ ইভিল' উৎপাদন করে, সেরা যোদ্ধা অর্জুন কৃষ্ণের 'নিমিত্তমাত্র' হতে পারেন, আপনার আমার মতো 'আত্ত্বাকল্যাণে'রা নয়, তাই কারণে অকারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষপ্রসূত বাত্তেলা লাইক শেয়ার বন্ধ করুন।

মনে রাখতে হবে মহিষাসুর প্রণম্য, তিনি বীর, বারংবার বিজয়ী এবং যথাযথ যোগ্যতায়। কোনো দেবতা একক বা সম্মিলিতভাবে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না, তাঁর জন্ম হয়েছিল দেবরাজ ইন্দ্রের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ নিতে (তপস্যারত জ্যেষ্ঠতাত-কে ছদ্মবেশে খুনের বদলা) এবং সেই বীরত্বেরও কৃতিত্ব নিয়ে রেখেছেন অগ্নি অথবা ব্রহ্মা এবং অবশ্যই শিব। মনে রাখবেন আপনি যখন দুর্গামূর্তিকে প্রণাম করেন, মহিষাসুরকেও করেন দেবীর আদেশে, কেননা কিছু পুরাণ অনুসারে তিনিই স্বয়ং শিব। অতএব মহিষাসুরকে আব্রাহামিক ধর্মের প্রভাবে 'শয়তান' ঠাওরাবেন না, অশুভ-শক্তির উপর শুভ-শক্তির বিজয় জাতীয় ভক্তিবাদী নিম্ন মেধার কেরেস্তানি-বেম্ম-বামুনে তত্ত্বে কান দেবেন না। বাস্তবে দেখুন বিজয়ী হলেই শুভ হয় না, মহিষাসুর সতেরো বার দেবতাদের পরাজিত করেছেন তাহলে তো তিনিই বেশি শুভকর প্রমাণিত হতেই পারেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় তিনি

সতেরো বার দেবতাদের পরাজিত করেও প্রধান দেবতা কাউকে হত্যা করেননি। দেবতারা অমর নন, তাঁদের জন্ম আছে, যৌবন আছে, মৃত্যু আছে। অমৃতের প্রভাবে জরা নেই মাত্র, এটি শাস্ত্র বাক্য। হয়তো যুদ্ধের ধরন অন্য ছিল, স্বর্গ শাসনের অধিকার পাওয়া যেত ভোটযুদ্ধের মাধ্যমে, নইলে সবাই দিব্যি বেঁচে রইল কীভাবে! ঋগ্বেদে বারংবার অসুরদের প্রণাম জানানো হয়েছে নেতা হিসেবে। পরাজিত হলেও যোগ্য প্রতিস্পর্ধী বিরোধী, গণতন্ত্রের সম্পদ। তিনি এক বৃহৎ অংশের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁকে সম্মান দিন, প্রণাম করুন। সাধারণ মানুষ তো আমরা, আমাদের উপকার হবে, স্রেফ ভোটার বা আধার কার্ডের নম্বর নয়, মানুষ হয়ে উঠতে পারব, যা আমাদের পিতামহগণ হয়ে উঠতে বলেছিলেন, আশীর্বাদ করেছিলেন। শিবমস্তু। শুভমস্তু।।

এই লেখার শেষে গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র নির্দেশ করতে গেলে সম্ভবত লেখার চেয়ে দীর্ঘ হয়ে যাবে, যাঁদের উদ্ধৃতি রয়েছে তাঁদের বইয়ের নাম সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অক্লেশে লিখে দেওয়া যেতে পারে, "যোগবলে প্রাপ্ত অধীত বিদ্যা তথা যেমত 'দর্শন' করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধকরণের পাপপ্রচেষ্টা, রৌরবে পতন অবধারিত জানিয়াও ভরসা এই যে ব্রহ্ম নির্বিকার।"

একথা গোপন থাকুক, শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার ইদুজ্জোহার দিন বিকারী বর্ষ বালব করণে তৈতিল যোগে স্বপ্নে স্বয়ং ভোলেবাবা এসে 'লেখ লেখ দরকার আছে' বলে বাড় খাইয়ে গেছিলেন!